প্রথম সংস্করণ
জন্মাষ্টমী ১৩৫৩

প্রকাশক
সুনীল ঘোষ
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ সজ্জা
মণীন্দ্র মিত্র

মুদ্রক
শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫এ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
প্রসেস সিণ্ডিকেট

দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা

রক্ত রাঙা রানী সিরি

॥ বাবুকে দিলাম ॥

॥ এক ॥

সন্ধ্যা হতে তখনো কিছুটা বিলম্ব আছে কিন্তু তবু সমস্ত আকাশটা কালো হয়ে গেল।

মেঘে ঢাকা আকাশ। ঝড় উঠবে।

উগ্রসেন তাড়াতাড়ি চলতে সুরু করলেন। ঝড় আসবার আগেই বাড়ি পৌঁছুতে হবে।

অন্যান্য পথচারীরাও দ্রুতগতিতে গন্তব্য পথের দিকে এগিয়ে চলল।

এমন সময় কিসের একটা শব্দ শুনে উগ্রসেন মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন।

খট্-খট্—খট্খট্……খটাখট্—খটাখট্……

দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছে একটানা একটি শব্দ।

উগ্রসেন মুখ তুলে তাকালেন।

কালো বিন্দুর মত কি যেন এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে। বিন্দুর চতুর্দিকে পথের ধুলা চক্রাকারে উড়ে উড়ে যেন একটা রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে।

ওই ধুলার কুণ্ডলী কি আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস?

বিন্দু অনেকটা নিকটবর্তী হল। স্পষ্ট দেখা না গেলেও উগ্রসেন বুঝতে পারলেন যে পথের ধুলা উড়িয়ে এগিয়ে আসছেন একজন অশ্বারোহী। পরিধানে তার সৈনিকের বেশ। মাথায় উষ্ণীষ, কটিবন্ধে খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।

অশ্বারোহী বার বার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। ঝড় উঠবে এই আশঙ্কায় অশ্বের গতি দ্রুততর করে এগিয়ে আসছেন তিনি।

আগন্তুক সৈনিক, কিন্তু কোন রাজ্যের? ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কোন রাজ্যের অবশ্যই নয় কারণ তা হলে উগ্রসেন বুঝতে পারতেন। এ দেশের সৈনিকদের দেহের রঙ অত ফর্সা নয়।

রাজধানী মশকাবতীতে যে সমস্ত সৈনিক টহল দিয়ে বেড়ায়, মালাকান্দ গিরিপথের মধ্য দিয়ে যারা যাতায়াত করে তারা উগ্রসেনের পরিচিত।

তবে কে এ সৈনিক? বিদেশী না ভারতের অন্য কোন সীমান্ত থেকে এসেছে। কিন্তু কেন?

উগ্রসেনের মনে অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে উঁকি মারতে থাকে। তার কপালের ক্ষত চিহ্নটা লাল হয়ে ওঠে।

ঝড়ের বাতাস দ্রুত বইতে শুরু করেছে শোঁ শোঁ শব্দে। যে কোন মুহূর্তে প্রবল বর্ষণ সুরু হতে পারে।

উগ্রসেন তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগলেন।

অকস্মাৎ পিছন থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল।

—দাঁড়ান, একটু অপেক্ষা করুন।

উগ্রসেন তাকিয়ে দেখেন অশ্বারোহী তাকেই ডাকছেন। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

নিমেষের মধ্যে অশ্বারোহী উগ্রসেনের সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

ততক্ষণে বর্ষণ সুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে বিদ্যুতের চমক।

—আমি বিদেশী। এই ঝড়জলে অশ্বচালনা অসম্ভব। তাছাড়া এখানকার পথঘাট সমস্তই আমার অপরিচিত। দয়া করে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

—কোথায় যাবেন আপনি?

—মশকাবতীর রাজপ্রাসাদে। মশকাবতী আর কত দূরে?

—এটাই মশকাবতী। আর কিছুদূর অগ্রসর হলেই নগর-প্রাকার দেখতে পাবেন।

—কিন্তু ঝড়জল মাথায় করে আজি যেতে চাইনা। একটা আশ্রয়ের সন্ধান দিতে পারেন ?

উগ্রসেন কি যেন ভাবলেন। তারপর আপন মনেই বললেন হয়তো সুযোগ উপস্থিত। যদি তাই হয় তবে তার সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রকাশ্যে বললেন—যদি বিশ্বাস হয় তবে আজ রাত্রের মত আমার গৃহেই আশ্রয় নিতে পারেন।

—আপনাকে আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করছি। আপনার গৃহ কতদূরে ?

—নিকটেই। বেশীদূর যেতে হবে না।

আগন্তুক উগ্রসেনের গৃহে যেতে সম্মত হলেন।

—চলুন, আপনার আতিথ্যই গ্রহণ করলাম।

চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। একে ঝড়জল তার উপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পথ দেখা যায়না।

পাহাড়ী পথ—বন্ধুর, অসমতল। অশ্বচালনা অসম্ভব।

আগন্তুক অশ্বের বল্গা ধরে উগ্রসেনের সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

বিদ্যুতের আলোকে পথ দেখে তাঁরা যখন উগ্রসেনের গৃহে এসে পৌছুলেন তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে। তার সঙ্গে অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুতের দীপ্তি আর মেঘের গর্জন।

এক দুর্যোগময়ী সন্ধ্যায় উগ্রসেনের পরিচয় হল বিদেশীর সঙ্গে কিন্তু না হলেই বুঝি ভাল ছিল। কিন্তু এ নিয়তির বিধান, রোধ করবে কে?

বেশ পরিবর্তন করে দুজনে মুখোমুখী বসলেন। প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ আর নেই।

—আপনি বিদেশী। কোথা থেকে আসছেন ?

—আমি সুদূর গ্রীস দেশের অধিবাসী। পারস্য হয়ে বর্তমানে ভারতবর্ষে এসেছি।

উগ্রসেন বিস্মিত হলেন।

—শুনেছি গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ের অভিলাষে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওনা হয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি পারস্য জয় করেছেন। আপনি কি—

—আপনার অনুমান যথার্থ। আমি সম্রাট আলেকজাণ্ডারের আজ্ঞাবহ একজন গ্রীক সৈনিক। সম্রাটের আদেশে মশকাবতীর রাজার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।

—আপনার নাম জানতে পারি কি?

—অবশ্যই পারেন। আমার নাম ফিলিপ্পাস। আপনার?

—আমি মশকাবতীর একজন শ্রেষ্ঠী। নাম উগ্রসেন।

উগ্রসেন কি যেন ভাবতে থাকেন। দুৰ্দ্ধর্ষ আলেকজাণ্ডার আজ ভারতের মাটিতে! একটা উত্তেজনায় তার ঠোঁটদুটি কাঁপতে থাকে। কপালের চিহ্নটা আবার লাল হয়ে ওঠে।

ফিলিপ্পাসই এই নীরবতা ভাঙলেন।

—কি ভাবছেন?

উগ্রসেন একটু হেসে বললেন—আমরা একজন অপরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি, অথচ কি আশ্চর্য দেখুন কিছুতেই আমরা আপন হতে পারছিনা।

—কেন, আমরাতো বন্ধুর মতই কথা বলছি।

—না, বলছিনা। বন্ধু বন্ধুকে আপনি বলে সম্বোধন করেনা।

ফিলিপ্পাস হো হো করে হেসে উঠলেন।

—ও, এই কথা। ঠিক আছে, এখন থেকে তুমি বলেই সম্বোধন করব।

উগ্রসেন খুশী হয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—এবারে আমরা সত্যি সত্যি বন্ধু। কি বল?

ফিলিপ্পাসও উগ্রসেনের হাতে চাপ দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—হ্যাঁ, আমরা বন্ধু।

উগ্রসেন তেমনি হাসতে হাসতে হঠাৎ বলে উঠলেন—গ্রীক সম্রাট কি ভারতবর্ষ জয় করতে চান ?

ফিলিপ্পাসের হাসি থেমে গেল।

—বন্ধু, আমি সম্রাটের দূত মাত্র। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করার অধিকার আমার নেই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করোনা। আর করলেও কোন উত্তর পাবে না।

উগ্রসেন তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন।

—আমাকে ভুল বুঝোনা বন্ধু। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করিনি। শুধু কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—কৌতূহল দমন করতে শেখ। রাজনীতি বড় কূট আর জীবনটা বড় মধুর। রাজনৈতিক কূটখেলায় জীবনটা বলি দিয়ে কোন লাভ নেই।

উগ্রসেন গুম হয়ে কতক্ষণ বসে রইলেন। পরে বলে উঠলেন—বন্ধু, যদি জানতে আমার বুকে কি জ্বালা। জীবনে আমার সুখ নেই, শান্তি নেই। সব নষ্ট হয়ে গেছে। জীবন মধুর হতে পারে কিন্তু সে জীবন আমার নয়।

ফিলিপ্পাস লক্ষ্য করলেন উগ্রসেনের চোখ দুইটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

উগ্রসেন বলে চললেন—তোমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছি। আমার দুঃখের কথা সব তোমাকে বলব। তবে আজ নয়। যদি সুযোগ পাই তবে আর একদিন বলব। কিন্তু সে সুযোগ কি পাব আর ?

ফিলিপ্পাসের মন সহানুভূতিতে নরম হয়ে উঠল।

—কেন সুযোগ পাবেনা, নিশ্চয় পাবে।

—তোমরা বিদেশী। আজ এসেছ, কাল চলে যাবে। তোমার সঙ্গে আর হয়তো দেখাই হবে না।

—না বন্ধু তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমি যতদূর

জানি আমরা এ রাজ্যে কিছুদিন থাকব। তোমার মত বন্ধু পেয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

উগ্রসেনের চোখদুটিতে একটা জিঘাংসার আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠল কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। ফিলিপ্পাস তা লক্ষ্যও করলেন না। পরক্ষণেই তিনি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

—আমার কথা থাক। রাজার কাছে কি প্রয়োজনে?

—সম্রাটের আদেশ। তিনি রাজার সখ্য কামনা করেন।

—ভাল। গিয়ে চেষ্টা করে দেখ।

উগ্রসেনের কণ্ঠে নির্লিপ্ততার সুর। ফিলিপ্পাস বুঝতে পেরে বললেন—মহারাজের সৌভাগ্য যে গ্রীক সম্রাট তার বন্ধুত্বে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তুমি কি মনে কর মহারাজ এই আহ্বানে সাড়া দেবেন না।

—রাজার ইচ্ছার মূল্য কতটুকু? তার চাওয়া না চাওয়ায় কি আসে যায়?

ফিলিপ্পাস কিছু বুঝতে পারলেন না।

—হেঁয়ালি রেখে সোজা করে বল কি বলতে চাও।

—রাজা নামমাত্র। আসলে এ রাজ্যের অধীশ্বর পুণ্ডরীক।

—কে তিনি?

—রাজগুরু পুণ্ডরীক। তিনিই রাজার প্রধান উপদেষ্টা।

ফিলিপ্পাস ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলেন।

—মনে হচ্ছে, তুমি পুণ্ডরীকের প্রতি সন্তুষ্ট নও।

—আমি কেন, এ রাজ্যের কেউ সন্তুষ্ট নয়। শুধু ভয়ে মুখ বুজে আছে সব।

—পুণ্ডরীকের অপরাধ কি?

—প্রজাপুঞ্জের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। নিজের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করাই তার একমাত্র কাজ।

—তোমাদের রাজা কি রকম লোক?

—তিনি লোক খুব খারাপ নন।

—তবে তোমরা রাজার কাছে যাওনা কেন?

—তিনি বিশ্বাস করবেন না। পুণ্ডরীকের কথায় তিনি ওঠেন বসেন। যে অভিযোগ করতে যাবে, সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবে না।

ফিলিপ্পাস চুপ করে রইলেন। কি বলবেন খুঁজে পেলেন না।

উগ্রসেন পুনরায় বললেন—পুণ্ডরীকের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাই। তুমি আমাদের সাহায্য করবে?

ফিলিপ্পাস ধনুকের ছিলার মত লাফিয়ে উঠলেন।

—আমি? আমি কি করে সাহায্য করব।

—হ্যাঁ, তোমরা পার আমাদের সাহায্য করতে। কেমন করে পার তা আমি বলে দিতে পারি।

ফিলিপ্পাস কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

—বেশ বল তোমার অভিপ্রায়।

উগ্রসেন নিম্নকণ্ঠে বললেন—গ্রীক সম্রাট অনায়াসে মশকাবতী জয় করে প্রজাপুঞ্জের হাতে তুলে দিতে পারেন। আমরা তাকে সাহায্য করব।

ফিলিপ্পাস হাসলেন। বিচিত্র সে হাসি।

—গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার যদি মশকাবতী অধিকার করতে চান, তবে তোমাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন হবেনা। তার বাহুতে অসীম ক্ষমতা।

উগ্রসেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

—ভুল করলে বন্ধু। মশকাবতীর সঙ্গে অন্য রাজ্যের তুলনা করনা। চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখো এ রাজ্য কেমন সুরক্ষিত। ,প্রকৃতি নিজের বুকে আগলে রেখেছেন এই পার্বত্য রাজ্যটিকে। চতুর্দিকেই পাহাড়। সমস্ত গিরিপথ সুরক্ষিত। সেই গিরিপথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

—তাহলে তোমরা কি ভাবে সাহায্য করতে চাও ?

—সে কথা আজ বলবনা। সাহায্যের বিনিময়ে আমাদের স্বার্থ সিদ্ধ হবে এমন প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত সে কথা প্রকাশ করব না।

ফিলিপ্পাস তরল কণ্ঠে বললেন—দেখ বন্ধু, আমি সৈনিক। যুদ্ধবিদ্যা আমি ভাল বুঝি, রাজনীতি বড় কূট। তা আমি বুঝিনা। তোমরা যা চাও তা আমাকে বলে কোন লাভ নেই। তুমি বরং আমাদের সেনাপতি সেলিউকসের সঙ্গে পরামর্শ করতে পার।

—তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন ?

—যদি চাও আমি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—বেশ, আমি একটু ভেবে দেখি। পরে তোমাকে জানাব।

এমন সময় রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা শোনা গেল।

উগ্রসেন বললেন—অনেক রাত হয়েছে। এবার তুমি বিশ্রাম কর।

উগ্রসেন নিজের কক্ষে ফিরে এসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। ঘুমোতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

পাগলের মত. আপন মনে বলে উঠলেন—পার্বতী বাঈ, তোমাকে আমার চাই।

তার কপালের ক্ষত চিহ্নটা লাল হয়ে উঠেছে—গাঢ় লাল।

॥ দুই ॥

রাজকুমারী পার্বতীবাঈ।

কোন রাজার ঘরে তার জন্ম হয়নি, এমন কি কোন রাজবংশেও নয়। তবু সে মশকাবতীর রাজকন্যা কুমারী পার্বতীবাঈ।

সে এক ইতিহাস।

এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিল কঙ্কণা। শৈশবেই হারিয়েছিল তার মাকে। পিতা ভাস্করবর্মা মায়ের মত যত্নে আর স্নেহে তাকে মানুষ করেছিলেন।

ভাস্করবর্মা খাঁটি মানুষ ছিলেন। মানুষের মত মানুষ।

গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ঋজু চেহারা আর অসীম তার মনের বল। মিথ্যা প্রবঞ্চনা কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। সর্বোপরি তিনি ছিলেন নির্ভীক। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি কোনদিন।

ভাস্করবর্মার এই চারিত্রিক তেজস্বীতার জন্য একদিন ইতিহাসের চাকা গেল ঘুরে। ব্রাহ্মণ কন্যা কঙ্কণা হল মশকাবতীর রাজকুমারী পার্বতী বাঈ।

দীর্ঘ পনের বৎসর পূর্বেকার কাহিনী।

পর পর দুবছর অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। চাষের জমি খাঁ খাঁ করতে লাগল। যে জমিতে প্রতি বৎসর সোনার ফসল জন্মাতো, তাতে এককণা ফসলও ফলল না।

চাষীরা দেবতার কাছে মানত করল কিন্তু দেবতা বধির, তাঁর কানে চাষ.দের অশ্রুভরা আবেদন পৌঁছুলো না। জমির ফসল আর ফলের গাছ জলের অভাবে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শুকিয়ে গেল।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনিয়ে উঠল দেশের বুকে। ঘরে ঘরে হাহাকার রব উঠল। বুকফাটা কান্নার রোলে বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

দুর্ভাগ্য কখনো একা আসেনা।

একে বিধাতার অভিশাপ তার উপর সুরু হল রাজপুরুষদের অত্যাচার।

গৃহে অন্ন নেই অথচ রাজপুরুষেরা রাজকর আদায়ের জন্য চাষীদের উপর জুলুম করতে কসুর করলনা।

রাজকর দিতে হবে। কেমন করে দেবে, কোথা থেকে দেবে সে

সব প্রশ্ন রাজপুরুষের কাছে অবান্তর। যেমন করে পার, যেখান থেকে হোক রাজকর দিতে হবে।

রাজকর দিতে অসমর্থ হলে রাজপুরুষেরা তাদের বাড়ি লুঠ করে কর আদায় করতে আরম্ভ করল। ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দিল। এর উপর দৈহিক নির্যাতন তো আছেই।

গৃহস্থ আর চাষীরা দল বেঁধে ভাস্করবর্মার কাছে উপস্থিত হল।

—আপনি এর প্রতিকারের একটা ব্যবস্থা করুন। নইলে আমরা সবাই মারা যাব।

কিন্তু কি প্রতিকার করবেন ভাস্করবর্মা? তিনি ভাবতে থাকেন।

—আপনি জ্ঞানী, পণ্ডিত। আপনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে আর কে করবে? আমাদের আর আছে কে?

কথাটা মিথ্যা নয়। যে কোন অসুবিধা হলে তারা ছুটে আসে ভাস্করবর্মার কাছে। তাঁর উপদেশ মাথা নত করে গ্রহণ করে চাষীরা।

ভাস্করবর্মা বললেন—কতদূর কি করতে পারব জানি না, তবে চেষ্টা করে দেখি। আমি আজই দেখা করব হস্তীর সঙ্গে। তাকে সব বুঝিয়ে বলব।

এ অঞ্চলের রাজপ্রতিনিধির নাম হস্তী। তিনি যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি নীচ। দয়া, মায়া, এই সমস্ত গুণগুলি তার কাছে দুর্বলতা।

ভাস্করবর্মা জানতেন কোন ফল হবে না, তবু দেখা করলেন হস্তীর সঙ্গে।

সব শুনে হস্তী হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

রাজকর? সে তো দিতেই হবে। অত ভাবতে গেলে রাজত্ব করা চলে না।

—কিন্তু দেবে কোথা থেকে ? দেশে দুর্ভিক্ষ। লোকে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। পিতামাতার চোখের সামনে না খেতে পেয়ে শিশু মরে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তারা কি করবে ?

—কি করবে তা আমার জানবার কথা নয়। রাজার আদেশ—কর দিতেই হবে। আমি তা আদায় করছি মাত্র। যদি কেউ কর ফাঁকি দিতে চায় তবে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। আমার কর্তব্যকর্মে আমি অবহেলা করতে পারি না।

—আপনি দেশের প্রকৃত অবস্থা রাজাকে জানান। তিনি হয়তো কোন ব্যবস্থা করবেন।

—রাজাকে জানানোর দায়িত্ব আমার নয়। তাছাড়া সে কাজ আমার অধিকারের বাইরে।

—কিন্তু আপনি যদি প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না করেন তবে সবাই মারা যাবে।

হস্তী আবার তেমনি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

—আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি। মৃত্যুই যদি ভবিতব্য হয় তবে আমরা তা রোধ করতে পারব না। এ কথা নিশ্চয় আপনার অজ্ঞাত নয়।

এর উপর আর কথা চলে না। ভাস্করবর্মা ফিরে এলেন শূন্য হাতে। চাষীরা আবার ঘিরে ধরল ভাস্করবর্মাকে।

—শুনেছি রাজগুরু পুণ্ডরীকের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আপনি পত্র লিখে তাঁকে সংবাদ দিন। তিনি দয়া করলে আমরা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।

পুণ্ডরীকের সঙ্গে ভাস্করবর্মার পরিচয় ছিল। শৈশবে তাঁরা একই গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

উপায়ান্তর না দেখে ভাস্করবর্মা চিঠি লিখলেন পুণ্ডরীকের কাছে।

পত্রের প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন, পরে চাষীদের দুর্দশার কথা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। প্রতিকারের জন্য তিনি যে

রাজপ্রতিনিধি হস্তীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তাতে যে কোন ফল হয়নি, সে কথাও উল্লেখ করতে ভুললেন না।

পত্র শেষ করে একজন বিশ্বস্ত অনুচরের হাতে দিলেন।

—রাজধানী মশকাবতী গিয়ে একমাত্র পুণ্ডরীকের হাতে এই চিঠি দেবে। সাবধান! এ চিঠির কথা আর কেউ যেন জানতে না পারে।

পত্র নিয়ে অনুচর রওনা হয়ে গেল মশকাবতীর উদ্দেশে।

পত্রবাহক রওনা হয়ে গেলে ভাস্করবর্মা আর একটি চিঠি লিখলেন। অনুরূপ চিঠি, হুবহু এক।

দ্বিতীয় পত্রখানা তিনি একটি তামার মাদুলিতে ভরে মাদুলির মুখ ভাল করে বন্ধ করলেন। পরে খাঁচা থেকে বার করলেন একটি শিক্ষিত পারাবত।

পারাবতের পায়ে মাদুলিটি ভাল করে বেঁধে তাকে উড়িয়ে দিলেন। শিক্ষিত পারাবত নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভাস্করবর্মা খুব ভাল করে চিনতেন হস্তীকে। শয়তানিতে তার জুড়ি নেই। তাছাড়া তার গুপ্তচর সর্বত্র। পত্রবাহক নির্বিঘ্নে মশকাবতী পৌঁছুতে পারবে কিনা, এ বিষয়ে ভাস্করবর্মার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

ভাস্করবর্মার অনুমান নির্ভুল। পথিমধ্যে পত্রবাহক বন্দী হল। তাকে নিয়ে যাওয়া হল হস্তীর কাছে।

হস্তীর আদেশে পত্রবাহকের দেহ খানাতল্লাশ করে পাওয়া গেল ভাস্করবর্মার পত্র। পত্র পড়তে পড়তে হস্তীর মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! এর সমুচিত দণ্ড দিতে হবে ভাস্করবর্মাকে।

সেইদিনই সন্ধ্যার পরে কয়েকজন রাজপুরুষ এসে উপস্থিত হল ভাস্করবর্মার বাড়িতে। ভাস্করবর্মা বাড়িতেই ছিলেন। তিনি বার হয়ে এলেন।

—কি চাই?

—ভাস্করবর্মা কার নাম? আমরা তাকেই চাই।

—আমিই ভাস্করবর্মা।

—আপনি মহামান্য হস্তীর বিরুদ্ধে রাজদরবারে অভিযোগ করতে চেয়েছিলেন। আপনার এ কাজ রাজদ্রোহিতার নামান্তর।

—কোন অভিযোগ করিনি। যা সত্য তাই আমি রাজদরবারে জানাতে চেয়েছি।

—আপনি কি চেয়েছিলেন তা আমরা জানি। পুণ্ডরীকের নিকট আপনি যে পত্র লিখেছিলেন তা আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই সেই পত্র।

রাজপুরুষ পত্র বার করে দেখাল। ভাস্করবর্মা বুঝলেন তার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে। পত্রবাহক বন্দী হয়েছে হস্তীর হাতে।

কিন্তু নিরাশ হলেন না। তাঁর শিক্ষিত পারাবত নিশ্চয়ই পুণ্ডরীকের হাতে চিঠি পৌঁছে দিয়েছে।

রাজপুরুষ পুনরায় বলল—আপনার অপরাধ আপনি স্বীকার করেন কিনা।

—না কোন অপরাধ আমি করিনি।

—আপনি কি জানেন না যে রাজদরবারের কোন সংবাদ দিতে হলে তা রাজ প্রতিনিধির মারফৎ পাঠাতে হয়।

—রাজ প্রতিনিধি যদি সে সংবাদ রাজদরবারে পাঠাতে না চান।

—তবে বুঝতে হবে, সে সংবাদ রাজদরবারে যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

—এ নীতি আমি মানিনা। প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি রাজ প্রতিনিধি যদি চোখ বুজে থাকেন তবে যে কোন রাজভক্ত প্রজা তা রাজার গোচরে আনতে পারেন। শান্তি রক্ষাকারীরা যদি শান্তিহন্তা হয় তবে প্রজারা কি করবে বলতে পারেন?

রাজপুরুষের মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠল।

—রাজনীতি নিয়ে আপনার সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে চাইনা। মাননীয় হস্তী আপনাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে এক লক্ষ মুদ্রা দণ্ডবিধান করেছেন।

—এ বিচার কে করলে ?

—বিচার নিস্প্রয়োজন। মাননীয় হস্তীর আজ্ঞা আমাদের নিকট যথেষ্ঠ।

—আপনাদের নিকট যথেষ্ঠ হতে পারে কিন্তু আমি তা মানিনা !

—আপনাকে মানতে বাধ্য করা হবে।

রাজপুরুষের ইঙ্গিতে অন্যান্য রাজপুরুষেরা এগিয়ে এল। একদল গিয়ে ঢুকল ভাস্করবর্মার ঘরে।

চার বছরের কঙ্কণা ভয়ে আর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কিন্তু তাতে রাজপুরুষেরা কর্ণপাত করল না।

রাজপুরুষেরা ঘরে ঢুকে জিনিষপত্র লুঠ করতে লাগল। ঘরের আসবাবপত্র লাঠির ঘায়ে ভেঙে চুরমার করে দিল।

ভাস্করবর্মা বাধা দিতেই, তার মাথায় একজন লাঠির আঘাত করল। তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। রক্তে মাটি লাল হয়ে উঠল। সেই সংজ্ঞাহীন দেহে রাজপুরুষেরা পুনঃ পুনঃ লাঠির আঘাত করতে লাগল।

প্রতিবেশীরা ছুটে এল ভাস্করবর্মাকে সাহায্য করতে কিন্তু রাজপুরুষদের সঙ্গে পেরে উঠলনা।

রাজপুরুষের দল ভাস্করবর্মার গৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রস্থান করল।

নৈশ আকাশ সে আগুনের শিখায় লাল হয়ে উঠল।

শিক্ষিত পারাবত ভাস্করবর্মার চিঠি পৌঁছে দিয়েছিল পুণ্ডরীকের কাছে।

সংবাদ পেয়ে পুণ্ডরীক নিজেই এলেন ভাস্করবর্মার সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভাস্করবর্মা তখন আর জীবিত নেই।

প্রতিবেশীরা যাবতীয় সংবাদ পুণ্ডরীকের গোচরে এনে এর প্রতিকারের দাবী জানাল। পুণ্ডরীক তাদের আশ্বাস দিলেন।

কঙ্কণার কথা পুণ্ডরীক শুনেছিলেন প্রতিবেশীদের নিকট। তিনি বললেন—ভাস্করবর্মার আর কে আছে?

—চার বৎসরের কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই।

পুণ্ডরীক খানিক্ষণ কি যেন ভাবলেন।

—কঙ্কণাকে আমি নিয়ে যেতে চাই।

এ প্রস্তাবে কেউ অমত করল না। বরং খুশী হল সকলেই। ভালই হল। মা-বাপ হারা কঙ্কণার ভালই হবে এতে।

চার বছরের কঙ্কণাকে নিয়ে পুণ্ডরীক উপস্থিত হলেন মশকাবতীর রাজপ্রাসাদে।

কঙ্কণাকে দেখে চমকে উঠলেন মহারাজ। সেই চোখ, সেই মুখ, হুবহু এক। কী আশ্চর্য সাদৃশ্য।

রাণী কৃপাবাঈ এর কাছে নিয়ে এলেন কঙ্কণাকে।

কৃপাদেবীও চমকে উঠলেন কঙ্কণাকে দেখে। তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে কেঁদে ফেললেন।

—পার্বতীবাঈ, এ যে আমারই পার্বতীবাঈ।

রাণী ছিলেন নিঃসন্তান। একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্মেছিল তাঁর। তার নাম রেখেছিলেন পার্বতীবাঈ। রাণী কৃপাবাঈ এর কন্যা পার্বতীবাঈ।

কিন্তু বছর দেড়েক আগে সে সন্তান মারা যায়। বেঁচে থাকলে সে আজ কঙ্কণার সমবয়সী হতো।

বিধির কি বিচিত্র খেয়াল।

কঙ্কণাকে দেখতে ঠিক পার্বতীবাঈ এর মত। দেহের রঙ, চোখ মুখের গড়ন, সব এক রকম।

রাণী বুকে তুলে নিলেন শিশুকন্যাকে। মা বাপ হারা কঙ্কণা আজ থেকে রাজকন্যা। আর তার নাম কঙ্কণা নয় পার্বতী বাঈ।

ব্রাহ্মণকন্যা কঙ্কণা সেইদিন থেকে হল মশকাবতীর রাজকুমারী পার্বতী বাঈ।

কিন্তু এ ঘটনা দীর্ঘ পনের বৎসর পূর্বেকার ইতিহাস।

এখন পার্বতী বাঈ-এর বয়স উনিশ। যৌবনের স্পর্শ পেয়ে সে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

কঙ্কণা রাজপুরীতে আসার বছরখানেক পর রাজা একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেছিলেন। সে এখন চতুর্দশ বৎসরের কিশোর যুবরাজ কিশোর দেব।

পার্বতীবাঈ আর কিশোরদেব। উভয়ের মধ্যে অদ্ভুত প্রীতির সম্পর্ক। কে বলবে তারা সহোদর ভাই-বোন নয়!

পার্বতীবাঈএর বিবাহ স্থির হয়ে আছে পুষ্করাবতীর রাজপুত্রের সঙ্গে। বিবাহ হয়ে যেতো অনেকদিন আগেই কিন্তু হয়নি। কারণ রাজগুরু পুণ্ডরীকের নিষেধ।

পুণ্ডরীক গণনা করে দেখেছেন যে উনিশ বছর বয়সে পার্বতীবাঈ এর একটি মৃত্যুযোগ রয়েছে। সেই অশুভ ফাঁড়া কেটে যেতে আর বেশী বিলম্ব নেই। তাই মহারাজ স্থির করেছেন আগামী মাসেই একটি শুভ দিন দেখে পার্বতীবাঈ এর বিয়ে দেবেন।

সঠিক দিন ধার্য হয়নি এখনো। শীঘ্রই পুণ্ডরীক স্থির করবেন শুভ বিবাহের দিন ক্ষণ।

সমস্ত রাজপুরীতে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল।

আর পার্বতীবাঈ?

একটা অপরিচিত আনন্দ তার সর্বাঙ্গে জাগাল পুলকের শিহরণ।

তিন

পার্বতীবাঈ-এর বিবাহ আসন্ন।

পুণ্ডরীক আজ বিবাহের দিন ধার্য করে সংবাদ পাঠাবেন পুষ্করাবতীতে।

মহারাজ তার যোগ্য আয়োজন করতে লাগলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ একটি ঝড়ে সমস্ত ওলট পালট হয়ে গেল।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

পুণ্ডরীক প্রতিদিন প্রত্যূষে স্নান করে কিছুক্ষণ বিগ্রহ মূর্তির কাছে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন। তারপর পূজা শেষ করে আশীর্বাদী নিয়ে আসেন রাজপ্রাসাদে।

রাজা আশীর্বাদের ফুল মাথায় নিয়ে সুরু করেন তাঁর রাজকার্য।

এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি কোনদিন।

আজও পুণ্ডরীক পূজায় বসেছিলেন।

কিন্তু এ কি হল আজ?

ধ্যানস্থ হয়ে আজ পুণ্ডরীক এ কি দেখলেন?

উন্মত্তের মত পুণ্ডরীক রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটলেন।

রাজা পুণ্ডরীকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

পুণ্ডরীক এসেই বললেন—রাজা, এ বিবাহ হবে না। উৎসব বন্ধ কর।

মহারাজ বিস্মিত হলেন। বিহ্বল নেত্রে তিনি তাকালেন পুণ্ডরীকের মুখের দিকে।

—হবে না? কেন, কি হয়েছে গুরুদেব?

—এখনো কিছু হয়নি কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি শীঘ্রই কিছু

ঘটবে। আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করব। পার্বতীবাঈএর এখনো উনিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়নি। উনিশ পার না হওয়া পর্যন্ত তার বিবাহ অসম্ভব।

—আপনি বড় বিচলিত হয়ে পড়েছেন গুরুদেব। সব কথা আমাকে খুলে বলুন।

মহারাজ লক্ষ্য করলেন পুণ্ডরীকের চোখে মুখে গভীর আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

—দেবতা অপ্রসন্ন হয়েছেন। দেবতার রোষ আমি নিজের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।

মহারাজ অধীর হয়ে উঠলেন।

—গুরুদেব, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছিনা। দেবতার অমঙ্গল যদি আসে মাথা পেতে তা গ্রহণ করব। আপনি বলুন কি হয়েছে।

পুণ্ডরীক বলতে লাগলেন—প্রতিদিনের মত আজও আমি স্নান করে বিগ্রহ মূর্তির পূজায় বসেছিলাম। চোখ বুজে ধ্যান করছিলাম। অকস্মাৎ দেখলাম—

পুণ্ডরীক চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। মহারাজ সে নীরবতা ভেঙে বললেন—কি দেখলেন গুরুদেব?

—দেখলাম আকাশের এক কোণে একটি বাজপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই কালো বাজপাখিটি উড়তে উড়তে রাজপ্রাসাদের চূড়ায় এসে বসল আর সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘে ছেয়ে গেল সমস্ত আকাশ। আঁধারে ঢেকে গেল চতুর্দিক। এত আঁধার যে কিছুই দেখা যায় না।

—তারপর?

—এর পরেই সুরু হল প্রবল বাতাস। প্রচণ্ড ঝড় আর অবিরাম বর্ষণ। কিন্তু রাজা, সেই বর্ষণের ধারা জলের নয়, রক্তের ধারা। সমস্ত মশকাবতী রক্তস্নাত হল।

মহারাজ শিউড়ে উঠলেন।

পুণ্ডরীক বলে চললেন—একটা প্রচণ্ড ভূ-কম্পনে সমস্ত পৃথিবী থরথর করে কেঁপে উঠল। নগরীর সমস্ত বাড়ি ঘর এমন কি রাজ-প্রাসাদ পর্যন্ত বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের মত ভূমিসাৎ হল। অকস্মাৎ মন্দিরের মাঝখানটা দ্বিধা হয়ে একটি ফাটলের সৃষ্টি হল আর সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল আমার বিগ্রহ মূর্তি।

পুণ্ডরীক ছোট শিশুর মত কেঁদে ফেললেন। মহারাজ স্থির হয়ে বসে রইলেন পাষাণ মূর্তির মত।

পুণ্ডরীক আবার বলতে সুরু করলেন—এখানেই শেষ নয় রাজা, আরো আছে। শোন।

মহারাজ নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত বললেন—বলুন।

—একটু পরেই ঝড় থেমে গেল। থেমে গেল ভূমিকম্প। সমস্ত আকাশের রঙ পালটে গেল। কালোর চিহ্ন নেই, তার পরিবর্তে লাল হয়ে উঠেছে আকাশ। আগুনের মত লাল। সেই আগুনের স্পর্শ লাগল পতিত বাড়ি ঘরে আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে লোকজন। আগুনের শিখা যেন তাড়া করেছে তাদের। ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। আর ধ্যান ভাঙ্গার পরে দেখি—

—কি দেখলেন গুরুদেব ?

—দেখি আমার বিগ্রহ মূর্তি আর দাঁড়িয়ে নেই।

পুণ্ডরীক থামলেন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল।

মহারাজ স্থির নিশ্চল।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললেন না।

একটু পরে ধীরে ধীরে মহারাজ বললেন—দেবতার এই রোষ নিবারণের উপায় কি গুরুদেব ?

—এখনো কিছু ভাবিনি রাজা। যা দেখেছি সব তোমাকে বললাম। তবে এটুকু বুঝেছি যে এ বিবাহ আপাততঃ বন্ধ রাখতে হবে। সামনে ঘোর দুর্দিন।

এমন সময় প্রতিহারী এসে ঘরে ঢুকল।

—মহারাজ, গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডারের দূত আপনার দর্শন প্রার্থী।

মহারাজ বিস্মিত হলেন।

—আলেকজাণ্ডারের দূত? আশ্চর্য।

পুণ্ডরীক বললেন—শুনেছি অমিত বলশালী এই গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার। কিছুদিন আগে তিনি পারস্য সম্রাটড্যরিয়স্‌কে পরাজিত করে পারস্য জয় করেছেন। এইবার বোধহয় তাঁর দৃষ্টি পড়েছে সুজলা সুফলা ভারতবর্ষের উপর।

মহারাজ চিন্তান্বিত হলেন। পুণ্ডরীকের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। কি চান আলেকজাণ্ডার?

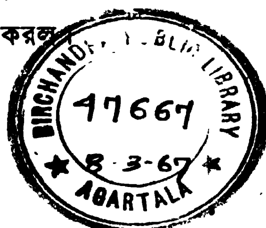
পুণ্ডরীক পুনরায় বললেন—রাজা, শক্তিতে আলেকজাণ্ডার এখন পর্যন্ত অপরাজেয় সুতরাং বাহুবলে তাঁকে পরাস্ত করা প্রায় অসম্ভব। আবার তাঁর বশ্যতা স্বীকার করার অর্থ দেশজননীকে যবনের হাতে তুলে দেওয়া, তাও অসম্ভব। কৌশলের আশ্রয় ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নেই।

—আপনি কি আদেশ করেন?

—তাড়াহুড়া করে আমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। গ্রীক সম্রাটের উদ্দেশ্য কি তা জেনে কর্তব্য স্থির করা যাবে। সুতরাং গ্রীক দূতের বক্তব্য আমরা প্রথমে শুনতে চাই।

মহারাজ প্রতিহারীকে আদেশ করলেন—গ্রীকদূতকে সসম্মানে মন্ত্রণাকক্ষে উপস্থিত কর। আর মন্ত্রীমণ্ডলীকে সংবাদ দাও তাঁরা যেন অবিলম্বে মন্ত্রণা কক্ষে উপস্থিত হন।

প্রতিহারী অভিবাদন করে প্রস্থান করল।



রাজা ও পুণ্ডরীক মন্ত্রণা কক্ষে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য মন্ত্রণাদাতারাও স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হলেন।

একটু বাদেই গ্রীক দূতকে সেখানে নিয়ে আসা হল।

গ্রীকদূত মহারাজকে যথাযোগ্য সম্ভ্রম জানালেন।

—আমি মহামান্য গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের আদেশে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার নাম ফিলিপ্পাস। এই আমার পরিচয় পত্র।

গ্রীকদূত তার পরিচয় পত্র মহারাজের নিকট পেশ করলেন। মহারাজ তা ভাল করে দেখে পুণ্ডরীকের হাতে দিলেন।

—বলুন ফিলিপ্পস, গ্রীক সম্রাট আমার নিকট কি সংবাদ পাঠিয়েছেন।

—মহারাজ, সম্রাট আপনার বন্ধুত্ব কামনা করেন।

—বন্ধুত্বের অর্থ কি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা ?

—আপনি ভুল বুঝবেন না মহারাজ। আপনার রাজ্যের প্রতি সম্রাটের বিন্দুমাত্র লোভ নেই। তা যদি থাকত তবে অনায়াসে তিনি মশকাবতী আক্রমণ করতে পারতেন। শক্তিশালী পারস্য সাম্রাট ড্যারিয়স যাঁর ভয়ে পলায়ন করেছিলেন তাঁর পক্ষে ক্ষুদ্র মশকাবতী জয় করা মোটেই দুঃসাধ্য হত না।

—আমার বন্ধুত্বে সম্রাটের এত আগ্রহ কেন ?

—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর অসীম কৌতূহল। তিনি শুনেছেন ভারতবাসী সরল, উদার আর অতিথি পরায়ণ। তাই তিনি ভারতবাসীদের বন্ধু হিসাবেই পেতে চান তা ছাড়া এই মিত্রতার ফলে আপনিও লাভবান হবেন।

—কি রকম ?

—আমার অপরাধ নেবেন না মহারাজ। আমরা জানি ভারতবর্ষের ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে তেমন সদ্ভাব নেই। একের সঙ্গে অপরের বিরোধ লেগেই রয়েছে। সেই হিসাবে আপনার

পাশাপাশি রাজ্যগুলির সঙ্গে আপনার সদ্ভাব না থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। গ্রীক সম্রাটের বন্ধুত্বের ফলে আপনি অধিকতর শক্তিশালী হবেন। তাছাড়া—

—তাছাড়া, কি ?

গ্রীক সম্রাট বৈরী হলে যুদ্ধ অনিবার্য। সেক্ষেত্রে মশকাবতী আত্মরক্ষায় কতখানি সমর্থ সে সম্বন্ধেও মহারাজকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

মহারাজ রুষ্ট হলেন।

—আপনাদের সম্রাট কি আমাকে ভয় দেখিয়ে বন্ধুত্ব পেতে চান ?

ফিলিপ্পাস যেন লজ্জিত হলেন।

—না মহারাজ, মোটেই তা নয়। তিনি সত্যিই আপনার মিত্রতায় আগ্রহশীল। আমি সেই বার্তা নিয়েই এখানে উপস্থিত হয়েছি। সম্রাটের ইচ্ছা আপনাকে জানিয়েছি। আমি বার্তাবাহক দূত মাত্র। আপনার যা অভিরুচি বলুন, আমি সম্রাটকে তাই নিবেদন করব।

—গ্রীক সম্রাট বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছেন ?

—মশকাবতীর সীমান্তের বাইরে একটি সমতল ভূমিতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। মহারাজের মতামত জানার পর তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করবেন।

—আপনাদের বক্তব্য আমরা শুনলাম গ্রীকদূত। আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাবার পূর্বে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে চাই। আপনি ততক্ষণ বিশ্রাম করুন। আলোচনার পর আপনাকে আমাদের মতামত জানাব।

ফিলিপ্পাস সানন্দে সম্মত হলেন।

—উত্তম, আমি অপেক্ষা করব।

প্রতিহারীর সঙ্গে ফিলিপ্পাস প্রস্থান করলেন।

এরপর সুরু হল নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ। এমন অবস্থায় এখন কি কর্তব্য।

পুণ্ডরীকের মন বিমর্ষ।

—ভগবানের কি অভিপ্রায় জানিনা। আমার দুঃস্বপ্ন এত শীঘ্র ফলতে শুরু করবে কল্পনাও করতে পারিনি।

মহারাজ সকলের মতামত জানতে চাইলেন।

—আমাদের সামনে কঠিন পরীক্ষা। এর উপর নির্ভর করছে মশকাবতীর ভাগ্য, তার স্বাধীনতার প্রশ্ন আর আমাদের সকলের শুভাশুভ।

দু-একজন নিজেদের মত ব্যক্ত করলেন।

—যুদ্ধ করতে আমরা ভয় পাইনা মহারাজ। আমাদের সোনার দেশকে কিছুতেই যবনের হাতে তুলে দেব না।

পুণ্ডরীক বললেন—এ কথা অবশ্যই সত্য কিন্তু আলেকজাণ্ডারের বিরাট বাহিনীর তুলনায় আমাদের শক্তি কতটুকু। যুদ্ধের পথে না গিয়ে অন্য কোন পথ আছে কিনা আমি তাই ভাবছি।

অপর একজন বললেন—আমার মনে হয় আলেকজাণ্ডারও যুদ্ধ চান না। তার এই সখ্য কামনার প্রস্তাব আন্তরিক বলেই মনে হয়।

মহারাজ জবাব দিলেন—গ্রীক সম্রাট চতুর, অতিশয় কুশলী। তিনি জানেন সুউচ্চ পর্বতমালার পক্ষপুটে আশ্রিত মশকাবতী জয় করা খুব সহজ নয়। এখানকার গিরিপথ তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত তাছাড়া তাঁর সৈন্যরা ক্লান্ত। কিছুদিন অপেক্ষা করে পথ ঘাট ভাল করে জেনে পরে হয়তো তিনি আক্রমণ করবেন মশকাবতী।

নানা জনে নানান কথা বললেন কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারলেন না।

অবশেষে অনেক ভেবে পুণ্ডরীক একটি উপায় স্থির করলেন।

—রাজা, আমার মনে হয় বন্ধুত্বের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই

বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এতে আমরাও কিছুটা সময় পাব প্রস্তুত হবার জন্য। পরে তার শক্তি সামর্থের পরিচয় নিয়ে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করব।

সকলে গভীর মনযোগ সহকারে পুণ্ডরীকের প্রস্তাব শুনতে লাগলেন।

—কিন্তু আমাদের সর্বদা সাবধানে থাকতে হবে। যবনকে বিশ্বাস নেই। আমরা তার সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করব মাত্র আর সেই অভিনয় নিখুঁত হওয়া চাই যাতে গ্রীক সম্রাট কিছুমাত্র সন্দেহ করতে না পারেন। আলেকজাণ্ডারকে আমরা অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানাব কিন্তু তার বাহিনীকে রাখব নগর প্রাকারের বাইরে। কেবল সম্রাট এবং তাঁর কয়েকজন দেহরক্ষীকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করব।

উপস্থিত সকলেই পুণ্ডরীকের যুক্তি গ্রাহ্য বলে মনে করলেন।

পুণ্ডরীক আবার বললেন—ইতোমধ্যে আমরা প্রস্তুত রাখব আমাদের সৈন্যদের। গিরিপথের নানা স্থানে সতর্ক প্রহরীরা প্রতি মুহূর্তে পাহাড়া দেবে। গ্রীক সম্রাট বিশ্বাস ঘাতকতা করলে আমরা তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেব। আলেকজাণ্ডার চতুর কিন্তু আমরাও মূর্খ নই।

আলোচনা শেষ হলে গ্রীকদূত ফিলিপ্পাসকে পুনরায় আহ্বান করা হল।

ফিলিপ্পাস উপস্থিত হলে মহারাজ তার সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করলেন।

—গ্রীক সম্রাটের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই সুতরাং তাকে বন্ধুভাবে পেলে আমরা আনন্দিতই হব। সম্রাটকে জানাবেন তার প্রস্তাব আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করছি।

ফিলিপ্পাস খুশী হলেন।

—মহারাজকে ধন্যবাদ। সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন জেনে তিনিও খুব খুশী হবেন।

—সম্রাটকে আরও জানাবেন যে তিনি যেন তাঁর বাহিনী নিয়ে আমার নগর প্রাকারের বাইরে যে সমতল ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে তাঁর শিবির স্থাপন করেন। আমার দূত তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। আর আমি নিজে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসব রাজপ্রাসাদে।

গ্রীকদূত ফিলিপ্পাস অভিবাদন করে প্রস্থান করলেন।

সভাভঙ্গ হল।

পুণ্ডরীক মহারাজকে নিয়ে গোপন কক্ষে ঢুকলেন।

—রাজা, আজই গোপনে দূত পাঠাও পুষ্করাবতী আর অস্তক রাজ্যে। চিঠি লিখে সমস্ত সংবাদ তাদের গোচরে এনে তাদেরও প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ জানাও। বলে দিও, যদি মশকাবতী পদানত হয় তবে এই কালসাপের হাত থেকে তারাও নিস্তার পাবে না।

মহারাজ সম্মত হলেন।

—যদি পুষ্করাবতী, অস্তক আর মশকাবতী এই তিন শক্তি একত্রিত হয়ে গ্রীকবাহিনীকে প্রতিহত করে তবে আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের এই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকেই আলেকজাণ্ডারকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সেই রাত্রেই দুজন দূত চিঠি নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল দুদিকে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ঘোড়া ছুটে চলল দ্রুততম গতিতে।

॥ চার ॥

সেই রাত্রে আরও একজন অশ্বারোহী নিঃশব্দে ছুটে চলেছিল অরণ্য পথের মধ্য দিয়ে।

অতি সাবধানে লোকচক্ষুর আড়াল দিয়ে সন্তর্পণে ছুটে যাচ্ছিল সে।

অশ্বারোহী অশ্বচালনায় অতিশয় নিপুণ। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সর্পিল পথ ধরে চড়াই উৎরাই অনায়াসে পার হতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না।

অশ্ব ছুটেছে দ্রুত গতিতে।

কে এই অশ্বারোহী?

এই অশ্বারোহী আমাদের পরিচিত শ্রেষ্ঠী উগ্রসেন।

কোথায় চলেছে এত রাত্রে? কি তার অভিপ্রায়?

অনেকটা পথ অতিক্রম করে সে একটি বড় বাড়ির সামনে এসে থামল।

ফটকের কাছে আসতেই দ্বাররক্ষী ফটক খুলে দিল। উগ্রসেন নিঃশব্দে অন্দরে প্রবেশ করলেন।

ফটক আবার বন্ধ হয়ে গেল।

গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষে এক ব্যক্তি অধীর আগ্রহে উগ্রসেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি যেন খুবই চিন্তাকুল। অসংখ্য চিন্তারাশী তার মাথায় খেলে বেড়াচ্ছে, তাই তিনি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না। অস্থির চিত্তে তিনি কক্ষ মধ্যে পদচারণা করছিলেন।

উগ্রসেন ঘরে ঢুকতেই লোকটির মুখে ফুটে উঠল কুটিল হাসির রেখা।

—এই যে, এসেছ উগ্রসেন। বস।

উগ্রসেন বসলেন।

—পথে কোন বিঘ্ন হয়নি তো? তোমার আগমন সংবাদ নিশ্চয়ই কেউ জানতে পারেনি।

উগ্রসেনের মুখেও তেমনি কুটিল হাসি। তার কপালের চিহ্নটা লাল হয়ে উঠছে।

—আমাকে অত নির্বোধ ভাববেন না হস্তী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার আগমন বার্তা কেউ জানেনা। আমি অতি সাবধানে পথ চলেছি।

—উত্তম। এবারে সংবাদ কি বল।

—সংবাদ শুভ। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত।

—কিন্তু ভুলে যেয়োনা উগ্রসেন পুণ্ডরীক অসাধারণ ব্যক্তি। যেমন কূট তেমন বিচক্ষণ। তার চোখে ধূলো দিয়ে কাজ করতে হবে। ধরা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। এবার আর ক্ষমা করবে না।

—পুণ্ডরীককে আপনার চাইতে আমি কম জানিনা হস্তী। কিন্তু আমি বলে রাখছি, পুণ্ডরীকের দিন শেষ হয়ে এসেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি রাজসিংহাসনে বসেছেন আপনি। আপনিই হবেন মশকাবতীর রাজা—মহারাজ হস্তী।

হস্তী সাপের মত ক্রূর দৃষ্টিতে তাকালেন উগ্রসেনের দিকে।

—অত লোভ এখন দেখিও না উগ্রসেন। আমি জানি, তুমি কুশলী। তোমার আর আমার মধ্যে বয়সের অনেক ব্যবধান। তা সত্বেও তোমাকে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছি এই জন্য যে তুমি বুদ্ধিমান। এই মুহূর্তে অত স্বপ্ন না দেখাই ভাল। আমাদের পথে দুস্তর বাঁধা।

—সেই বাঁধা আমরা অতিক্রম করব। তা দুঃসাধ্য হতে পারে কিন্তু অসাধ্য নয়।

—তা যদি পার তোমার কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। দীর্ঘ পনের বৎসর আগেকার কাহিনী আমি আজও ভুলিনি উগ্রসেন। ভুলতে পারবও না। রাজা ভাল মানুষ তাই আজও আমি বেঁচে আছি।

—হ্যাঁ শুনেছি মহারাজ আপনাকে প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন।

—কিন্তু পুণ্ডরীক আমাকে বধ করতে চেয়েছিলেন। রাজাকে তিনি সেইরূপ পরামর্শই দিয়েছিলেন। সেই দিন বাধ্য হয়ে আমি মহারাজের পদপ্রান্তে পড়ে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলাম। মহারাজের দয়ায় আমি আজও জীবিত কিন্তু মশকাবতী প্রবেশের অধিকার আমার নেই। জন্মভূমি থেকে আমি বহিষ্কৃত হয়েছি।

—আবার আপনি ফিরে যাবেন মশকাবতীতে। এবার যাবেন মাথা উঁচু করে রাজ্য শাসন করতে।

হস্তীর মুখখানা আরও বীভৎস হয়ে উঠল।

—তুমি ভেবনা উগ্রসেন যে মরতে আমি ভয় পাই। মৃত্যুভয় আমার নেই। তা সত্ত্বেও সেদিন আমি অপমানিত হয়ে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলাম। কেন চেয়েছিলাম জান?

উগ্রসেন কোন কথা বললেন না।

—চেয়েছিলাম এই জন্য যে বেঁচে থাকলে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পাব।

—আজ সেই সুযোগ উপস্থিত। আপনি প্রস্তুত হোন।

—দীর্ঘ পনের বৎসর ধরে আমি প্রস্তুত উগ্রসেন। এই দীর্ঘকাল কি জ্বালা বুকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি তা তুমি বুঝবে না। সেই জ্বালা আমি জুড়াতে চাই আর তার জন্য প্রয়োজন পুণ্ডরীকের রক্ত।

একটু থেমে হস্তী আবার বললেন—ভাস্করবর্মাকে তোমার মনে আছে উগ্রসেন?

—আছে। আপনি তাকে হত্যা করে তার গৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। সে আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিন্তু আমার রোষ থেকে পরিত্রাণ পায়নি। ব্রহ্মহত্যা করতে সেদিন আমার হাত একটুও কাঁপেনি সুতরাং আর একবার ব্রহ্মহত্যা করতেও আমি দ্বিধা করবনা। এবার পুণ্ডরীকের পালা। তার রক্তে আমার বুকের আগুন নিভাতে চাই।

উগ্রসেন সোৎসাহে বললেন—এইবার আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। পুণ্ডরীক শুধু আপনার শত্রু নয়, সে আমারও শত্রু। আমিও তার মৃত্যু কামনা করি।

উগ্রসেন তার কপালের ক্ষত চিহ্নটায় হাত বুলাতে লাগলেন।

চিহ্নটা ভীষণ রকম লাল হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে ক্ষত চিহ্ন থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে।

—এই ক্ষতর জ্বালা আমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি এর প্রতিহিংসা নেব। যে আমার ললাটে এই কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দিয়েছে তাকে আমি জীবন থাকতে ক্ষমা করতে পারব না।

হস্তী বললেন—আমি জানি উগ্রসেন। তুমি আমাকে বলেছ। তুমি পার্বতীবাঈকে বিয়ে করতে চয়েছিলে।

—হ্যাঁ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আমি পুণ্ডরীকের কাছে গিয়েছিলাম। জানতাম পুণ্ডরীক মত করলেই আমি পার্বতীবাঈকে পাব কারণ মহারাজ পুণ্ডরীকের কথার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না।

—পুণ্ডরীক তোমাকে উপেক্ষা করেছেন।

—আমাকে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন পুণ্ডরীক।

—অথচ তোমার কি নেই? দেখতে তুমি সুপুরুষ তাছাড়া তোমার অর্থ আছে বিস্তর। কোন কিছুর অভাব নেই তোমার। পার্বতীবাঈকে সুখী করতে পারতে।

—পুণ্ডরীক আমাকে বার বার ফিরিয়ে দিয়েছেন। অপমানিত করেছেন বড় কম নয়। তবু আমি তার পায়ে ধরে অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম।

—তিনি তোমাকে পদাঘাত করেছিলেন।

উগ্রসেনের চোখ দুটি আহত শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল।

—শুধু তাই নয়। একটি কঠিন প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়ে মেরেছিলেন আমাকে লক্ষ্য করে। প্রস্তর খণ্ডটি লাগল আমার ললাটে। ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটল। তারই ফলে সৃষ্ট হল ললাটের এই কলঙ্ক তিলক।

উত্তেজনায় আর ক্রোধে উগ্রসেনের দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল।

—আমি এর প্রতিশোধ চাই।

উভয়ে অনেক্ষণ চুপ করে রইলেন। কেউ কোন কথা বললেন না।

এক সময় হস্তী বললেন—আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমাদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন। আমাদের বুদ্ধি আছে, অর্থও আছে, নেই শুধু জনবল।

উগ্রসেন হস্তীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমার বুদ্ধিমত চললে জনবলের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা দুজনেই যথেষ্ঠ। বরং তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। আমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছিনা, আমরা জিতব বুদ্ধির খেলায়।

হস্তী খুশী হলেন।

—সবই আপনাকে বলব। তার আগে আপনার সঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই।

—বেশ বল।

—আপনাকে আমি মশকাবতীর সিংহাসনে বসাব। আপনি পাবেন রাজত্ব আর আমি চাই—

—কি চাও তুমি ?

—রাজকন্যা। রাজকুমারী পার্বতীবাঈকে আপনি আমার হাতে তুলে দেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে হস্তী জবাব দিলেন — এটা কোন সমস্যাই নয়। তুমি না বললেও আমি পার্বতীবাঈকে তোমার হাতে তুলে দিতাম। আমি শপথ করছি, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হলে পার্বতীবাঈ তোমার।

উগ্রসেন এবার বিজ্ঞের মত বললেন—বেশ, শুনুন তবে এবার কাজের কথা। খুব শীঘ্রই একটা রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেবে।

—কিসে বুঝলে ?

—গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করে এখন ভারতবর্ষে এসে পৌছেছেন। তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি মশকাবতীর দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

হস্তী উৎসাহিত হলেন।

—তুমি ঠিক জান আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে এসেছেন?

—আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। এই কাঁটা দিয়েই আমরা কাঁটা তুলব।

—কি বলতে চাও তুমি?

—আমরা গ্রীক সম্রাটকে সাহায্য করব। তিনি যাতে মশকাবতী অধিকার করেন তার ব্যবস্থা করব।

—তাতে আমাদের লাভ?

—লাভ সম্পূর্ণ আমাদের। তিনি মশকাবতী জয় করে নিশ্চয়ই এখানে বসে থাকবেন না। তিনি যখন মশকাবতী পরিত্যাগ করে যাবেন তখন সিংহাসনে বসিয়ে যাবেন আপনাকে।

—তিনি আমাদের কথা শুনবেন কেন?

—যেহেতু প্রথম থেকেই আমরা তাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করে তাঁর প্রীতিভাজন হব। আপনি সম্রাটের আজ্ঞাধীন হয়ে রাজ্য শাসন করবেন।

—কিন্তু এ ব্যাপারে সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ করা কি করে সম্ভব হবে?

—সে ভার আমার। সম্রাট তাঁর দূত পাঠিয়েছেন মহারাজার নিকটে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিয়ে। দৈবক্রমে সেই দূতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এবং আমি তার মিত্রতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

উগ্রসেন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা হস্তীকে খুলে বললেন। সব শুনে হস্তী খুব আশান্বিত হলেন বলে মনে হল না।

বললেন—সম্রাটের বিরুদ্ধে মহারাজ যুদ্ধ করবেন এর কোন নিশ্চয়তা নেই। মহারাজ হয়তো সম্রাটের বন্ধুত্বের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করবেন।

—আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ অবশ্য প্রয়োজন। যাতে যুদ্ধ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

—কিন্তু কি উপায়ে তা করতে চাও ? পুণ্ডরীক হয়তো এমন চাল চালবেন যার ফলে মশকাবতীর স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে না অথচ সম্রাটের সঙ্গেও সদ্ভাব বজায় থাকবে।

উগ্রসেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন—পুণ্ডরীক আর পুণ্ডরীক! আপনি তাকে বড় বেশী মূল্য দিচ্ছেন।

—তুমি বৃথা রাগ করছো উগ্রসেন। শত্রুকে কখনো ছোট করে দেখতে নেই। পুণ্ডরীক আমাদের শত্রু হতে পারেন তা বলে তাঁর অতুলনীয় বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারব না।

—আপনি দেখে নেবেন বুদ্ধির খেলায় উগ্রসেনও কম যায় না। নিজের মুখেই কথাটা বলছি বলে আত্মপ্রশংসা ভাববেন না। কথাটা যথার্থ। উগ্রসেন একটু থেমে পুনরায় বললেন—পুণ্ডরীক আর উগ্রসেন—দেখব বুদ্ধির খেলায় কে হারে আর কে জেতে। প্রয়োজন হলে উগ্রসেন কতদূর যেতে পারে আপনার পুণ্ডরীক তা কল্পনাও করতে পারবেন না। দিনকয়েকের মধ্যেই আমি এর প্রমাণ দিতে পারব আশা করছি।

হস্তী তাকালেন উগ্রসেনের মুখের দিকে। দেখলেন তার চোখে শয়তানের হাসি। মুখখানা কদর্য, বীভৎস, যেন নরক নেমে এসেছে।

উগ্রসেন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—এবার আমি বিদায় নেব, হস্তী। যাবার আগে আমি আবার বলে যাচ্ছি, পুণ্ডরীক বা মহারাজ—কেউ যুদ্ধ এড়াতে পারবেন না। তাদের যে কোন ব্যবস্থা বানচাল করে যুদ্ধে নামাতে হবে। আর আমি তা করবই কারণ যুদ্ধ ছাড়া আমাদের স্বার্থ সিদ্ধির অন্য কোন পথ নেই। একমাত্র পথ যুদ্ধ, সুতরাং যুদ্ধ হবেই।

উগ্রসেন নিষ্ক্রান্ত হলেন।

হস্তী কিছু বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলেন নিশ্চল পাথরের মত।

॥ পাঁচ ॥

মশকাবতীর নগরপ্রাকারের বাইরে সমতল ভূমির ওপর তাঁবু পড়েছে গ্রীকবাহিনীর। ছোট বড় নানা ধরনের অসংখ্য তাঁবু। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র রাজ্য মশকাবতী। ছোট্ট রাজ্য, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়।

রাজ্যটির চতুর্দিক বেষ্টন করে রেখেছে পর্বতশ্রেণী। যেন সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেছে ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে—মাতা যেমন করে বুকে তুলে রাখেন তাঁর আদরের সন্তানকে।

দূরে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে রাণী-গিরির চূড়া। প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চূড়ায় ছড়িয়ে পড়ে উদীয়মান রবির প্রথম রশ্মি। রাণী গিরির মাথায় কে যেন একমুঠো আবীর ছড়িয়ে দেয়। তখন সমস্ত মশকাবতী রাজ্যটি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে নয়নাভিরাম বলে প্রতিভাত হয়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য—দেখে আর আশ মেটে না।

মশকাবতী আয়তনে ছোট, কিন্তু খুবই সমৃদ্ধিশালী। বিদেশীর আক্রমণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তারা জানে যে তাদের সুন্দর রাজ্যটিকে গ্রাস করার মত পররাজ্যগ্রাসীর অভাব নেই দুনিয়ায়। তাই তার সতর্ক বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে।

রাজধানীতে প্রবেশ করতে হলে একটি পরিখা পার হতে হয়। পরিখাটি প্রশস্ত ও বেশ গভীর। পরিখার নানা স্থানে কয়েকটি সেতু। রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে সেই সেতুগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছামত সেগুলো গুটিয়ে ফেলা যায়।

পরিখার অপর পারে নগরপ্রাকার। বেশ শক্ত ও মজবুত। প্রাকার এত উচ্চ যে বাইরে থেকে লঙ্ঘন করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া ভেতর থেকে আত্মরক্ষা করার সুবন্দোবস্ত আছে।

ইহা ব্যতীত রয়েছে অনেকগুলি গুপ্ত গিরিপথ আর গহ্বর। সেখান থেকে অনায়াসে শত্রুসৈন্যের ওপর আক্রমণ করা চলে। বাইরে থেকে সে আক্রমণ প্রতিহত করা খুবই কষ্টসাধ্য।

এই নগরপ্রাকারের বাইরে তাঁবু পড়েছে গ্রীক বাহিনীর।

গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি সেলিউকস। সম্রাট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলেন।

—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার অসীম কৌতূহল ছিল। ভারতবর্ষ আর ভারতবাসী সম্বন্ধে আমি অনেক কথা শুনেছি। আজ প্রত্যক্ষ দেখলাম। সত্যি অপূর্ব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ অতুলনীয়।

সেলিউকস বিনীত ভাবে জবাব দিলেন।

—সম্রাট যথার্থ কথাই বলেছেন। ভারতবর্ষ প্রকৃতি রাণী। এখানকার অধিবাসীরা দেশকে বলে ভারত মাতা। তারা দেশকে জননীর মতই ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। শুনেছি দেশের জন্য জীবন দিতে তারা একটুও দ্বিধা করেনা। হাসতে হাসতে তারা জীবন উৎসর্গ করে।

—আমিও সেকথা শুনেছি সেনাপতি। তাইতো আমার কৌতূহল ছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। কি অপূর্ব এই মশকাবতী রাজ্য। মহারাজ যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করেন তবে এই সুন্দর রাজ্যটিকে ধ্বংস করতে চাইনা। আমি বন্ধু ভাবেই এদের পেতে চাই।

সেলিউকস হেসে বললেন—আপনার মনোভাব আমি বুঝেছি সম্রাট। কিন্তু সব কিছুতো আমাদের উপর নির্ভর করেনা। তারা যদি সরল ভাবে আমাদের গ্রহণ করতে না পারেন।

—তবে তার ফল তারা হাতে হাতেই পাবে। আর কেউ না জানলেও আপনার জানা আছে সেনাপতি যে সেকেন্দর শাহ্ কাউকে ক্ষমা করেনা। আমার সঙ্গে চাতুরী করলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

—তা আমি জানি সম্রাট। শত্রুকে দয়া করলে সুদূর ম্যাসিডন থেকে আমরা ভারতবর্ষে আসতে পারতাম না। আর অন্যান্য রাজ্যের নিকট দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এত ভীতির কারণ হতেন না।

এমন সময় প্রহরী এসে সংবাদ দিল যে মহারাজ দূত পাঠিয়েছেন।

সম্রাট দূতের সঙ্গে দেখা করলেন।

দূত বললেন—গ্রীক সম্রাট দীর্ঘজীবি হউন।

দূতের সঙ্গে প্রচুর উপঢৌকন।

—বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ মহারাজ সম্রাটকে এই সমস্ত উপহার পাঠিয়েছেন।

উপহার সামগ্রী দেখে আলেকজাণ্ডার প্রীত হলেন।

—আপনাদের মহারাজের ব্যবহারে আমি খুবই আনন্দিত। আশাকরি তিনি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

রাজদূত বললেন—কথিত আছে শক্তিমানের সঙ্গে দুর্বলের সখ্য স্থায়ী হয়না। তবে শক্তিমান যদি দুর্বলকে বন্ধুত্বের মর্যাদা দানে অসম্মত না হন, দুর্বল তা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করে। আমাদের মহারাজ গ্রীক সম্রাটের পরাক্রম সম্বন্ধে অবগত আছেন। বিশেষ করে সম্রাটের সঙ্গে আমাদের বিরোধের কোন কারণ ঘটেনি সুতরাং আপনাকে বন্ধু ভাবে পেয়ে মহারাজ ধন্য হয়েছেন।

—আমিও তার বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহশীল ছিলাম। এখন মহারাজের মনোভাব জানতে পেরে খুবই প্রীত হয়েছি। এই মুহূর্ত থেকে আমি মহারাজকে বন্ধু বলে মনে করব।

রাজদূত পুনরায় অভিবাদন করল।

—সম্রাট মহানুভব। আমার আর একটি নিবেদন আছে।

—বলুন রাজদূত।

—সম্রাট, আমি দূত মাত্র। রাজাদেশে সংবাদ পরিবহণ করাই আমার একমাত্র কাজ। মহারাজ জানিয়েছেন যে তিনি স্বয়ং আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনাকে আপ্যায়ন করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবেন। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—আপনার বিশাল বাহিনীকে ক্ষুদ্র নগরীতে স্থান দেওয়া দুঃসাধ্য। আপনার সৈন্যদের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হোক মহারাজের তা অভিপ্রায় নয়।

—মহারাজের কি অভিপ্রায়?

—আপনার অনুমতি পেলে এই সমতল ভূমিতেই আপনার সৈন্যদের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হবে। এখানেও আতিথ্যের কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না সম্রাট।

—মহারাজ কবে আমার সঙ্গে দেখা করবেন?

—আজই তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

—বেশ, মহারাজ আসুন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই পরামর্শ করা যাবে।

রাজদূত অভিবাদন করে প্রস্থান করলেন।

সম্রাট সেলিউকসকে বললেন—আপনার কি মনে হয় সেনাপতি? এদের বন্ধুত্ব আন্তরিক?

—আমার মনে হয় মহারাজও আপনার বন্ধুত্ব কামনা করেন। তবে একটি বিষয়ে আমার সন্দেহ জাগছে।

—কোন বিষয়ে?

—মহারাজ গ্রীক বাহিনীকে নগরে প্রবেশ করতে দিতে চান না। সুতরাং স্বভাবতই সন্দেহ জাগে যে তিনি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছেন না।

আলেকজাণ্ডার চিন্তিত হলেন।

—কথাটা ভেবে দেখবার মত। তবে একথাও সত্য যে মশকাবতী ক্ষুদ্র রাজ্য। এত বড় বাহিনীকে নগরে স্থান দেওয়া প্রকৃতপক্ষে অসুবিধাজনক।

—আরও একটি কথা সম্রাট। মহারাজ নিজে এসে সম্রাটকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইবেন। সম্রাট কি মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করবেন ?

—এর মধ্যে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলে আপনি মনে করেন কি ? এই আতিথেয়তা একটা রাজনৈতিক অপকৌশল নয়তো ?

সেলিউকস একটু ভেবে বললেন—তেমন কিছু আছে বলে আমার মনে হয়না তবু সাবধান হওয়াই বোধহয় সমীচীন হবে।

—অর্থাৎ ?

—মহারাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করাই যুক্তিযুক্ত। কৌশলে মহারাজকে নিবৃত্ত করলে ভাল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আলেকজাণ্ডার রহস্য করে বললেন—সেনাপতি সেলিউকসের উপর আমার গভীর আস্থা রয়েছে। আমার অনুপস্থিতে নিপুন-ভাবে সৈন্যচালনা করতে সক্ষম হবেন আর বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তিবিধান করতে পারবেন।

সেলিউকস তেমনি তরল কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

—অধীনের প্রতি সম্রাটের অসীম করুণা জেনে আমি কৃতার্থ হলাম।

এমন সময় একজন প্রহরী প্রবেশ করল।

—মশকাবতীর মহারাজ এবং তাঁর প্রধান উপদেষ্টা আচার্য পুণ্ডরীক গ্রীক শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন।

আলেকজাণ্ডার খুশী হলেন।

—সেনাপতি, আপনি নিজে তাদের অভ্যর্থনা করে সসম্মানে নিয়ে আসুন।

সেলিউকস দ্রুত প্রস্থান করলেন।

একটু পরেই সেলিউকস পুণঃ প্রবেশ করলেন। তার সঙ্গে মহারাজ এবং পুণ্ডরীক।

আলেকজাণ্ডার তাঁদের আপ্যায়ণ করে পাশে বসালেন।

—আসুন মহারাজ, আসুন আচার্য পুণ্ডরীক। আপনাদের দর্শন পেয়ে আমি আনন্দিত।

মহারাজ বললেন—গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে অতিথিরূপে পেয়ে আমরা ধন্য।

পুণ্ডরীকও সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

—পরমেশ্বরের আশীর্বাদ সম্রাটের মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হোক। মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি আপনার মঙ্গল করুন। সম্রাট দীর্ঘজীবি হোন।

মহারাজ এবং পুণ্ডরীকের কথার মধ্যে আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে আলেকজাণ্ডার প্রীত হলেন।

—মহারাজের দূত মুখে শুনলাম যে আপনিও আমার সখ্য কামনা করেন। আর বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ যে সমস্ত মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছেন আমি তা সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করেছি।

—সামান্য উপহার। তবু সম্রাট যে তা গ্রহণ করেছেন তাতে আমরা কৃতার্থ হয়েছি।

পুণ্ডরীক বললেন—সম্রাটের হয়তো জানা নেই যে ভারতবাসী অতিথিবৎসল জাতি। অতিথিকে তারা দেবতাজ্ঞানে সেবা করে থাকে। এই রীতি চলে আসছে অতি প্রাচীনকাল থেকে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ এই শিক্ষাই ভারতবাসীকে দিয়েছে। আর ভারতবাসী তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

—আমি জানি আচার্য পুণ্ডরীক—সম্রাট বললেন—ভারত-বাসীদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথাও আমি সুদূর গ্রীস দেশে

বসে শুনেছি। শুনেছি ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ জাতি। শৌর্যে, বীর্যে ধর্মে সব দিক দিয়েই তারা আদর্শ স্থানীয়।

—সম্রাট ঠিকই শুনেছেন। বন্ধুত্বে ভারতবাসীর মত এতবড় বন্ধু আর নেই আবার শত্রুতায় সে ভয়ঙ্কর। দেশকে তারা মাতৃজ্ঞানে পূজা করে। দেশ মাতৃকার পবিত্রতা রক্ষার জন্য ভারতবাসী হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারে।

আলেকজাণ্ডারের মনে একটা সংশয় দেখা দিল। তিনি একবার সেলিউকসের মুখের দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পুণ্ডরীককে বললেন—প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্যরাশি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে ভারতের বুকে। ভারতবর্ষ প্রকৃতির রাণী। ভারতবাসীদের যথার্থ জননী হবার উপযুক্ত।

এবার মহারাজ আলেকজাণ্ডারকে প্রশ্ন করলেন।

—গ্রীকসম্রাট কি উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসেছেন, জানতে পারি কি?

আলেকজাণ্ডার হাসলেন।

—ভারত দর্শনের জন্য। পারস্য বিজয় সমাধা করে দেশে ফিরে যাব মনস্থ করেছিলাম। এমন সময় ভারতের মাটি যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সে আহ্বান আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। একবার দেশে ফিরে গেলে আর হয়তো কোনদিন আসা হবে না। তাই ভারত দর্শনের সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলাম না।

মহারাজ বললেন—তবে চলুন সম্রাট। চলুন আমার রাজপ্রাসাদে। আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন। বন্ধুকে সেবা করবার সৌভাগ্য থেকে আমাকে নিরাশ করবেন না।

পুণ্ডরীকও আমন্ত্রণ জানালেন।

—ক্ষুদ্র রাজ্য আমাদের মশকাবতী কিন্তু গ্রীক সম্রাটের বাহিনী সুবিশাল। এই বিশাল বাহিনীকে রাজপুরীতে স্থান দেওয়া

অসম্ভব। আমাদের অনুরোধ সম্রাট সপারিষদ আমাদের রাজ-প্রাসাদে এসে বিশ্রাম করুন। আপনার সৈন্যরা যাতে এখানেই নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা হবে।

আলেকজাণ্ডার যেন চিন্তিত হলেন। এই আমন্ত্রণকে তিনি সরল ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। একটা অবিশ্বাসের বীজ তাঁর মনের মধ্যে প্রবল ভাবে নড়াচাড়া করতে লাগল।

সিলিউকস ও নীরব। সম্রাটকে রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে গুপ্ত হত্যা করবেনা তো? তিনি সম্রাটের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মহারাজ বললেন—চিন্তার কোন কারণ নেই সম্রাট। ভারতবাসী গরীব হতে পারে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়।

আলেকজাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—না মহারাজ আমি আপনাদের মোটেই অবিশ্বাস করছিনা। একবার যখন বন্ধু বলে স্বীকার করেছি তখন আর অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন ওঠেনা।

পুণ্ডরীক আগ্রহ দেখিয়ে বললেন—তবে চলুন সম্রাট, মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের বন্ধুত্বকে চিরস্থায়ী করুন।

আলেকজাণ্ডার জবাব দিলেন—আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে পারলে আমিও খুব খুশী হতাম। কিন্তু প্রকৃতির এই শান্ত কোল ছেড়ে প্রাসাদে যেতে মন চাইছে না। এখানে এই উন্মুক্ত আকাশ, চারিদিকে প্রকৃতির অকৃপণ শ্যামলিমা। প্রভাতে পর্বত শিখরে ছড়িয়ে পড়ে অরুনোদয়ের স্বর্ণাভ মায়াজাল। নিশীথে জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত হয় ঘন সবুজ অরণ্যরাজী। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এর বিনিময়ে সুদৃশ্য হর্ম্যতলে পাব ইট পাথরের কৃত্রিম সৌন্দর্যরাশী। না মহারাজ, এই মুক্ত অঙ্গনেই আমাকে বাস করতে দিন। এখানে থাকলে মনে হবে আমি ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করছি। তাঁর অজস্র আশীর্বাদ ধারা আমার মস্তকে প্রতিমুহূর্তে বর্ষিত হচ্ছে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন—আপনাদের বন্ধুত্বই আমার কাম্য ছিল এবং তা আমি পেয়েছি। আপনারা অনুমতি দিন,

আমি সসৈন্যে এই সমতল উপত্যকাতেই দিন কয়েকের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করি।

পুণ্ডরীক বললেন—সম্রাটের যা অভিরুচি। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা আপনাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইনা।

মহারাজও এই ব্যবস্থায় সম্মত হলেন।

—তা হলে এখানেই আপনার আতিথেয়তার ব্যবস্থা করছি। সম্রাটের কিছুমাত্র অসুবিধা হলে তিনি যেন আমাকে সংবাদ দেন।

সভা ভঙ্গ হল।

আলেকজাণ্ডার হৃষ্ট চিত্তে বিদায় দিলেন মহারাজ আর পুণ্ডরীককে।

তাঁরা শিবির পরিত্যাগ করে নিজেদের রথে এসে বসলেন। রথ রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে চলল।

পুণ্ডরীক প্রথমে কথা বললেন।

—দেখলে রাজা, গ্রীক সম্রাট আমাদের কতখানি অবিশ্বাস করেন। অতি কৌশলে তিনি আমাদের আতিথ্য এড়িয়ে গেলেন।

মহারাজ চিন্তিত মুখে জবাব দিলেন—হুঁ, গ্রীক সম্রাট চতুর। তাঁর বাহিনীকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে না দিয়ে আমরা সুবিবেচনার কাজই করেছি।

পথে আর কেউ কোন কথা বললেন না।

উভয়ের মন বিমর্ষ।

মস্তকে চিন্তার ঘনঘটা।

॥ ছয় ॥

আয়োজনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেননি মহারাজ। গ্রীক বাহিনীর ভোজের ব্যবস্থা ভাল ভাবেই করলেন। মদ্য, মাংস কোন কিছুরই অভাব নেই।

আন্তরিকতার চাইতে রাজনৈতিক প্রয়োজন যেখানে বড় সেখানে বাইরের জাঁকজমক বজায় রাখতেই হবে।

ব্যবস্থা দেখে আলেকজাণ্ডারও খুশী হলেন। কোন কিছুর মধ্যেই তিনি ত্রুটি দেখলেন না। সংবাদ নিয়ে জানলেন তাঁর সৈন্যরাও পরমানন্দে খাদ্য সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করছে।

আলেকজাণ্ডার তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বরং আয়োজনের প্রাচুর্য তাকে সন্দিগ্ধ করে তুলল। এই ব্যবস্থাপনার অন্তরালে কোন অভিসন্ধি নেই তো?

তিনি সেনাপতি সেলিউকসকে ডেকে পাঠালেন।

সেলিউকস এলে বললেন—মহারাজকে আমরা কতখানি বিশ্বাস করতে পারি সেনাপতি?

—সন্দেহের কিছু আছে বলে মনে হয়না সম্রাট। তাছাড়া ক্ষুদ্র মশকাবতী দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের বিরোধিতা করতে সাহস পাবে বলেও মনে হয়না।

—আমারও তাই বিশ্বাস। তবে রাজনীতি বড় বিচিত্র। শুনেছি আচার্য পুণ্ডরীক অত্যন্ত কূট। রাজনীতিতে বিচক্ষণ।

—বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি বিধান করতে গ্রীক বাহিনীর বেশী সময় লাগবেনা সম্রাট্। প্রয়োজন হলে মশকাবতী ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে।

সেলিউকসের উক্তি মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। প্রয়োজন হলে আলেকজাণ্ডার কতখানি নৃশংস হতে পারেন তা জানে গ্রীক বাহিনীর প্রতিটি সৈন্য। এমন কি নিজের সৈন্যকেও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করেন না। সেই নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত উদাহরণ গ্রীক সৈন্য ডোরেণ্ডাস।

সেলিউকসের মানস নেত্রে সেদিনের ছবি আজও যেন ভাসছে।

সৈনিক ডোরেণ্ডাস।

বাহুতে ছিল অসীম বল। মনে ছিল দুর্জয় সাহস।

সামান্য সৈনিক হয়ে এসেছিল গ্রীক শিবিরে। ধীরে ধীরে প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের।

কিন্তু সম্রাটের আদেশেই তাকে মৃত্যু বরণ করতে হল।

হঠাৎ একদিন সম্রাট তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন। ঘোষণা শুনে চমকে উঠেছিল সকলেই। গ্রীক বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক।

কি অপরাধ করেছিল ডোরেণ্ডাস? সদা হাস্যময় অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিল সে। সকলের প্রিয়পাত্র, এমনকি সম্রাটেরও। কি তার অপরাধ?

কি অপরাধ কেউ জানলনা। সম্রাটের আদেশ পালিত হল। তার ছিন্ন শির লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কেউ না জানলেও জানতেন সেলিউকস। আলেকজাণ্ডার একমাত্র তাঁকেই বলেছিলেন ডোরেণ্ডাসের অপরাধের কথা।

বিশাল গ্রীক বাহিনীতে যত সৈন্য রয়েছে তারা সকলেই ম্যাসিডন হতে আসেননি। সম্রাট যখন কোন রাজ্য জয় করতেন তখন বিজিত রাজ্যের সৈন্য দিগকে নিজের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতেন। এমনি করে দিনে দিনে তাঁর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ডোরেণ্ডাস ছিল তেমনি এক বিজিত রাজ্যের সৈনিক। সেও যোগ দিয়েছিল গ্রীক বাহিনীতে। তার বন্ধুরা বিস্মিত হয়েছিল কারণ ডোরেণ্ডাস ছিল খাঁটি দেশভক্ত। দেশকে যারা পদানত করেছে তাদের দলে যোগ দেওয়ায় অনেক বন্ধু তিরস্কার পর্যন্ত করেছে কিন্তু ডোরেণ্ডাস কারও কথায় কর্ণপাত করেনি। অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে সে যোগ দিয়েছিল আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলে।

পরবর্তী ঘটনা জানা আছে সেলিউকসের।

অতি নিষ্ঠার সহিত ডোরেণ্ডাস পালন করেছে সৈনিকের প্রতিটি কর্তব্য। প্রতিটি যুদ্ধে সে বাহুবলের স্বাক্ষর রেখেছে। ক্রমে ক্রমে সে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে গ্রীক সম্রাটের।

তারপরে এল সেদিনের সেই রক্তাক্ত ঘটনা। ভাবতে আজও বিস্ময় লাগে সেলিউকসের।

আলেকজাণ্ডার রটনা করলেন যে তিনি একজন পত্র-বাহককে গ্রীসে পাঠাবেন। যদি কোন সৈনিক তার কোন আত্মীয় স্বজন বা প্রিয়জনকে পত্র লিখতে চায় তবে সে তা লিখে সম্রাটের কাছে জমা দিতে পারে। প্রতিটি পত্র যাতে যথাস্থানে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করবেন গ্রীক সম্রাট।

সৈনিকেরা সকলেই অনেকদিন দেশ ছাড়া। প্রায় সকলেই পত্র লিখল নিজেদের আত্মীয়ের কাছে।

ডোরেণ্ডাসও পত্র লিখলেন তার এক বন্ধুকে।

নির্দিষ্ট দিনে পত্রবাহক রওনা হয়ে গেল।

কিন্তু আলেকজাণ্ডারের কূটবুদ্ধির পরিচয় পেতে বাকী ছিল ডোরেণ্ডাসের। যখন পরিচয় পেল তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

রাতের অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে ফিরে এল পত্রবাহক সম্রাটের কাছে। কেউ তা জানল না সম্রাট পত্রবাহককে লুকিয়ে রাখলেন লোকচক্ষুর আড়ালে।

প্রতিটি পত্র সম্রাট নিজে পড়ে দেখলেন।

ডোরেণ্ডাসের পত্র পড়তে পড়তে ক্রোধে লাল হয়ে উঠলেন আলেকজাণ্ডার। কী সামান্য সৈনিকের এতদূর স্পর্দ্ধা। সে সেকেন্দর শাহর অনিষ্ট করতে চায়।

সেই মুহূর্তে তিনি ডেকে পাঠালেন সেলিউকাসকে।

সেনাপতি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে পত্রখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন—পড়ে দেখুন।

পত্র পড়ে সেলিউকস বিমূঢ় হয়ে গেলেন। কি দুর্জয় সাহস সৈনিক ডোরেণ্ডাসের। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে সে হত্যা করতে চায়!

চিঠির কয়েকটি ছত্র আজও মনে আছে সেলিউকসের।

"…বন্ধু, আমি ভুলিনি আমার দেশকে। ভুলতে পারিনা। আমার দেশকে যে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে সেই শয়তান সেকেন্দর শাহ্‌কে আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না। শুনে সুখী হবে আমি সম্রাটের অনেকটা প্রিয়পাত্র হয়েছি। আর কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হব। আর তখনই আমার স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ আসবে। আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার শুভলগ্ন আসন্ন। সেকেন্দর শাহ্‌র রক্ত নিয়ে আমি শীঘ্রই দেশে ফিরে যাব সে দিনের আর বেশী বিলম্ব নেই। বন্ধু! সেই মহাপূন্যক্ষণের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করো…"

ডোরেণ্ডাসের স্বপ্ন সফল হয়নি। পরদিনই সম্রাটের আদেশে তার মস্তক দেহচ্যুত হয়েছিল।

বেচারা ডোরেণ্ডাস!

* * * *

আলেকজাণ্ডার যখন সেনাপতি সেলিউকসের সঙ্গে কথা বলছিলেন, ঠিক সেই সময় নিকটস্থ বনে দুজন লোক গোপনে পরামর্শ করছিলেন।

একে গভীর বন তার উপর চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার। সুতরাং আত্মগোপন করতে মোটেই অসুবিধা নেই।

অতি অস্ফুট স্বরে তারা কথা বলছিলেন।

—আমি যেমনটি বললাম মনে থাকে যেন। একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু চরম সর্বনাশ।

—ঠিক আছে। আমাকে নির্বোধ ভেবনা। প্রাণের মায়া আমারও কম নেই।

—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের ঘণ্টাই হবে আপনার কাজের নিশানা।

—মনে আছে আমার।

—আমি এবার চলি।

—এস তোমার যাত্রা সফল হোক।

একব্যক্তি বন থেকে বেরিয়ে গেলেন। অপরজন একটি গাছে উঠে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে।

গ্রীক শিবিরে সৈন্যগণ নৈশ ভোজনে ব্যস্ত।

একটি তাঁবুতে কয়েকজন সৈনিক অতিরিক্ত সুরা পান করে হৈ হুল্লোড়ে মেতে রয়েছে। জনা কয়েক হরিণের মাংস আগুনে ঝলসিয়ে নিচ্ছে।

শিবিরের মধ্যে হট্টগোল কিন্তু বাইরে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। গাঢ় অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র উপত্যকায়।

বন থেকে বেরিয়ে এলেন একজন লোক মার্জারের মত নিঃশব্দে। তার সর্বাঙ্গ কৃষ্ণ বস্ত্রে আবৃত। গতি মন্থর।

লঘু পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন গ্রীক শিবিরের কাছে।

গ্রীক রক্ষী দেখতে পেল তাকে। কৃপান তুলে প্রশ্ন করল— কে তুমি?

—আমি গ্রীকদের হিতৈষী।

—কি চাও তুমি?

—ফিলিপ্পাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি আমার বন্ধু।

—এত রাত্রে কি প্রয়োজন?

—বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি তাকে সংবাদ পাঠাও।

—কি নাম তোমার?

—বল শ্রেষ্ঠী উগ্রসেন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রক্ষী তবু সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে। উগ্রসেন তার মনোভাব বুঝতে পেরে গায়ের কালো কাপড়টা খুলে মাটিতে ফেলে দিলেন। পরে বললেন—এই দেখ আমি নিরস্ত্র। সঙ্গে কিছুই নেই। অনর্থক তুমি আমাকে সন্দেহ করছ। বলোছতো ফিলিপ্পাস আমার বন্ধু। তাকে খবর দিলেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

রক্ষী একটু ভেবে বলল—এস আমার সঙ্গে।

উগ্রসেন রক্ষীকে অনুসরণ করলেন।

ফিলিপ্পাসকে পেতে বিলম্ব হলনা। উগ্রসেনকে এত রাত্রে দেখে তিনি খুবই বিস্মিত হলেন।

—কি ব্যাপার? তুমি এত রাত্রে?

—বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে কি আর এত রাত্রে তোমাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

—বেশ, বল তোমার কি প্রয়োজন।

উগ্রসেন কথা না বলে বক্রদৃষ্টিতে রক্ষীর দিকে তাকালেন। রক্ষী তখনো সেখানে উপস্থিত ছিল।

ফিলিপ্পাস রক্ষীকে বললেন—তুমি যেতে পার। এই ব্যক্তি আমার বন্ধু।

রক্ষী চলে গেলে তিনি আবার বললেন—এবারে বল।

—ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। নিরিবিলিতে শান্তভাবে কথাটা বলতে চাই।

—বেশ, এস আমার সঙ্গে।

ফিলিপ্পাস উগ্রসেনকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে এলেন।

—এখানে কেউ নেই আর আসবেও না কোন লোক। কি বলতে চাও, অনায়াসে বলতে পার।

উগ্রসেন খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে বললেন—শুনলাম গ্রীক সম্রাট আমাদের মহারাজকে বন্ধুত্বের সম্মান দিয়েছেন।

ফিলিপ্পাস হেসে উঠলেন।

—এ কথা বলতেই কি এত রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?

উগ্রসেন গম্ভীর হলেন।

—হেসোনা বন্ধু। মহারাজকে আমি তোমার চাইতে বেশী জানি। আর জানি পুণ্ডরীককে। তাদের এই বন্ধুত্ব একটি রাজনৈতিক অপকৌশল।

ফিলিপ্পাস সোজা হয়ে উঠলেন।

—কি বলতে চাও তুমি ?

—এই বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাস করিনা।

—তবে তুমি কি বিশ্বাস কর ?

এমন সময় রাজধানীতে দ্বিতীয় প্রহরের ঘণ্টা বেজে উঠল। উগ্রসেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তার কপালের চিহ্নটা লাল হয়ে উঠেছে।

—গ্রীক বাহিনী যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারে। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ধনুকের ছিলার মত লাফিয়ে উঠলেন ফিলিপ্পাস।

—ক্ষুদ্র মশকাবতীর অত স্পর্দ্ধা হবে না।

এমন সময় অকস্মাৎ গ্রীক শিবিরে একটা হৈ চৈ লেগে গেল।

তাঁবুতে আগুন লেগেছে।

পাশাপাশি অবস্থিত তাঁবুগুলি। একটার আগুন অপরটায় পৌঁছাল। এমনি করে একের পর আর একটিতে আগুন ধরল। নৈশ আকাশের অন্ধকার ভেদ করে আগুনের লেলিহান শিখা উর্ধ্বে উঠে আকাশ লাল হয়ে উঠল।

সৈন্যরা চিৎকার করে উঠল—শত্রু সৈন্য আমাদের আক্রমণ করেছে। সব প্রস্তুত হও।

ফিলিপ্পাস উগ্রসেনের হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে বললেন—খবরদার, পালাবার চেষ্টা করোনা।

উগ্রসেনের বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

—পালাব কেন ? তোমাকে তো আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম।

—ঠিক আছে। এখন চল আমাদের সেনাপতি সেলিউকসের কাছে।

এদিকে আগুন বেড়াজালের মত বেষ্টন করে ধরেছে।

কেউ কেউ বলল যে যারা মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছিল তাদের অসাবধানতার জন্যই আগুন লেগেছে তাঁবুতে। মদ খেয়ে তারা বেহুঁস হয়ে পড়েছিল তাই বুঝতে পারেনি কখন আগুন লেগেছে।

আবার কেউ বলল—না, এ শত্রুদের কাজ। অগ্নিবান দিয়ে তারাই তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

আলেকজাণ্ডারের কাছে সংবাদ পৌছুতেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। আগুন লাগার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে একটুও ভেবে দেখলেন না। তিনি ধরে নিলেন এ কাজ মশকাবতীর।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুকুম করলেন—ক্ষমা নেই বিশ্বাসঘাতকদের। এই মুহূর্তে নগর আক্রমণ কর। আজ রাত্রের মধ্যেই মশকাবতীকে ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

নিমেষের মধ্যে গ্রীক বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। তারা আক্রমণ করল মশকাবতী।

সৈন্যগণ চিৎকার করে উঠল—জয় গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের জয়।

॥ সাত ॥

আলেকজাণ্ডার যত সহজে মশকাবতী জয় করবেন ভেবেছিলেন কাজের বেলায় কিন্তু তত সহজ হলনা।

এই রকম একটা আক্রমণের আশঙ্কা মহারাজ এবং পুণ্ডরীক প্রথম থেকেই করেছিলেন। তাই তারাও প্রস্তুত ছিলেন প্রতিরোধের জন্য। তবে এত শীঘ্র আক্রান্ত হবেন সে কথা তারা ভাবতে পারেন নি।

নগরে বিশ হাজার সৈন্য ছিল। মহারাজ স্বয়ং ফৌজ নিয়ে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হলেন নগর রক্ষা করতে।

গ্রীক সৈন্য এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক তীর এসে পড়ল তাদের উপরে। শত্রুসৈন্য দেখা যায়না অথচ মুহুর্মুহু তীর বৃষ্টি হচ্ছে।

গ্রীক সেনাপতি বিব্রত হলেন কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই তিনি সৈন্যদের আদেশ দিলেন এগিয়ে যেতে। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে গ্রীক সৈন্য প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হল।

প্রাচীরের কাছে পৌঁছুতে হলে পরিখা পার হতে হবে। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? সেতু আছে বটে কিন্তু সেগুলো নগরের ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরিখা গভীর। কিছু সৈন্য সাঁতার কেটে ওপারে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু সফলকাম হলনা। পরিখা পার হবার আগেই অসংখ্য তীর এসে পড়ল তাদের উপর। ফলায় তীব্র বিষ মেশানো। ফলে মৃত্যু এসে গ্রাস করল তাদের।

গ্রীক সেনাপতি দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। পরিখা পার হতে হবে কিন্তু উপায় কি?

অদূরে একটি টিলা ছিল। সেনাপতি আদেশ দিলেন ওই টিলা কেটে পরিখায় মাটি ফেলতে হবে। মাটি আর পাথর দিয়ে বাঁধ সৃষ্টি করে পথ করতে হবে। নিকটস্থ বন থেকে গাছ কেটে আনার ব্যবস্থা হল। যে উপায়ে হোক পরিখা পার হয়ে প্রাচীর ডিঙিয়ে নগরে প্রবেশ করতে হবে।

গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার তখন শিবিরে বসে সেলিউকসের কথা শুনছিলেন। ফিলিপ্পাস এবং উগ্রসেনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন গ্রীক সৈন্যাধক্ষ্য।

একজন বললেন—উগ্রসেন নিশ্চয় শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। মৃত্যু-দণ্ডই তার একমাত্র শাস্তি।

কিন্তু কূটবুদ্ধি পরায়ণ আলেকজাণ্ডার উগ্রসেনকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যুদ্ধের গতিবিধির উপর সাময়িকভাবে নির্ভর করলেন।

এমন সময় সংবাদ এল যে শত্রুপক্ষ পূর্ব থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। অলক্ষ্য স্থান থেকে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বৃষ্টি করছে। গ্রীকবাহিনী একটুও অগ্রসর হতে পারছেনা। অধিকন্তু আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় কিছু সংখ্যক গ্রীক সৈন্য নিহত হয়েছে অথচ তারা শত্রুসৈন্যকে কোনরূপ আঘাত করতে সক্ষম হয়নি।

উগ্রসেন এই সুযোগ গ্রহণ করলেন।

—আমার দুর্ভাগ্য যে সম্রাট আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। অথচ এ রকম যে ঘটবে আমি আগেই তা বলেছি। মশকাবতী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে জেনেই আমি গ্রীক শিবিরে সংবাদ দিতে ছুটে এসেছিলাম। আমার শুভেচ্ছার বিনিময়ে আমি এখন বন্দী।

কেউ কোন জবাব দিলেন না।

উগ্রসেন পুনরায় বললেন—সম্রাট যদি আমাকে বিশ্বাস করেন তবে মশকাবতী জয়ের কৌশল আমি বলে দিতে পারি।

—আপনার কি বিশ্বাস যে আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি মশকাবতী অধিকার করতে পারব না।

—তেমন কথা আমি বলতে চাইনা। তবে সম্রাট যত সহজ ভাবছেন, তত সহজ হবেনা। নগর প্রকার অতিক্রম করা বড় কঠিন সম্রাট।

—আমি বিশ্বাস করি না। আমার অপরাজেয় বাহিনী মশকাবতী গ্রাস করবেই।

—তা হয়তো করবে তবে অনর্থক আপা‍ অনেক লোকক্ষয় হবে। অথচ আমাকে বিশ্বাস করলে আমি সহজ পথ বলে দিতে পারি।

একটু থেমে উগ্রসেন আবার বললেন—অপরাধ নেবেন না সম্রাট। যুদ্ধ সবেমাত্র সুরু হয়েছে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে

কারা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ? মশকাবতীর একটি সৈন্যও কি প্রাণ হারিয়েছে ? অথচ—

বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার করে উঠলেন আলেকজাণ্ডার।

—থামুন। জানেন এই মুহূর্তে আপনার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত করে দিতে পারি।

উগ্রসেন একটুও ভয় পেলেন না।

—তা আপনি পারেন সম্রাট কিন্তু তাতে মশকাবতীর কোন ক্ষতি হবে বলে মনে করি না।

আলেকজাণ্ডার এবার অন্যপথ ধরলেন।

—এত রাত্রে আমার শিবিরে আপনি কেন এসেছিলেন ? এর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চাই।

—আমি সম্রাটকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। এই কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক কি না সম্রাটই তা ভেবে দেখবেন।

—আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনি এত ব্যগ্র কেন ? আপনার উদ্দেশ্য কি ?

—অত্যাচারীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে চাই। ধূর্ত্ত পুণ্ডরীকের হাত থেকে মশকাবতী উদ্ধার করতে চাই।

আলেকজাণ্ডার আশ্চার্যান্বিত হয়ে উগ্রসেনের মুখের দিকে তাকালেন।

উগ্রসেন আবার বললেন—শুধু আমি নই সম্রাট। মশকাবতীর প্রতিটি লোক আমার পিছনে। দেশবাসীর ইচ্ছাতেই আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

আলেকজাণ্ডার গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

—তাহলে আপনারা আমাকে সাহায্য করতে চান, কেমন ?

—হ্যাঁ সম্রাট।

—এর বিনিময়ে আপনারা আমার কাছে কি প্রত্যাশা করেন ?

উগ্রসেনের চোখে সাপের খল দৃষ্টি। তার কপালের চিহ্নটা লাল হয়ে উঠল।

আলেকজাণ্ডার বললেন—আপনি কি মশকাবতীর সিংহাসনে বসতে চান ?

—না সম্রাট রাজা হবার বাসনা আমার নেই। আপনি আমাদের মনোনীত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাবেন। তিনি আপনার আজ্ঞাধীন হয়ে রাজ্যশাসন করবেন। এই আমাদের প্রার্থনা।

—উত্তম। আমি যদি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হই তবে কি ভাবে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন ?

উগ্রসেনের মন আনন্দে নেচে উঠল।

—মশকাবতী প্রবেশের একটি গুপ্ত পথ আছে। আমি আপনাকে তার সন্ধান বলে দেব।

—আপনি জানেন সেই গুপ্তপথের সন্ধান ?

—অবশ্যই জানি।

—কোথায় সেই গুপ্তপথ ? কোন দিকে ?

—ক্ষমা করবেন সম্রাট। আপনার সম্মতি এখনো পাই নি।

আলেকজাণ্ডার উগ্রসেনের দিকে তাকালেন। বুঝলেন উগ্রসেন চতুর।

—মশকাবতী জয় করার পর আমি যদি প্রতিশ্রুতি না রাখি।

উগ্রসেন হাসলেন।

—গ্রীক সম্রাট আর যাই হোন, মিথ্যাবাদী নন এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

আলেকজাণ্ডার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। পরে বললেন—বুঝেছি আপনি নির্ভীক। তবে আর একটি প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাস্য আছে।

—আদেশ করুন সম্রাট।

—আপনাকে বিশ্বাস কি। গুপ্তপথের সন্ধান দিতে গিয়ে

আমার সৈন্যদের বিপথে চালনা করবেন না তার কোন নিশ্চয়তা আছে?

উগ্রসেন এক মুহূর্ত ভাবলেন।

—আমাকে বিশ্বাস করতে হবে সম্রাট। আমরা যেমন আপনার কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছি তেমনি আপনিও আমাকে বিশ্বাস করবেন। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

আলেকজাণ্ডার সম্মত হলেন।

—উত্তম, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। তবে যতদিন আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হচ্ছে ততদিন আপনাকে আমার শিবিরেই থাকতে হবে।

উগ্রসেন দ্বিধাভরে সম্রাটের মুখের দিকে তাকালেন

—সম্রাট কি আমাকে বন্দী রাখতে চান?

—না, না, বন্দী নন। আপনি আমার সৈন্যদের গুপ্তপথের দিকে চালনা করবেন। আপনার সঙ্গে থাকবে আমার সৈন্যবাহিনী আর তার নেতৃত্ব করবেন আপনারই বন্ধু ফিলিপ্পাস।

—বেশ, আমি প্রস্তুত।

—এবারে গুপ্তপথের সন্ধান বলুন।

উগ্রসেন তার বস্ত্রের ভিতর থেকে অতি সাবধানে একখণ্ড পুরাতন কাগজ বার করলেন। কাগজ তো নয়, একখানা প্রাচীন নক্সা—মশকাবতীর নগরপ্রাকারের নক্সা।

এই নক্সা যখন তৈরি হয় তখন মশকাবতীর বনে বাস করতেন একজন সন্ন্যাসী। একটি গুহায় তিনি বাস করতেন। বাইরে বেরুতেন না। গাছের ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতেন।

এ এক প্রাচীন কাহিনী। মশকাবতীর সিংহাসনে তখন বর্তমান মহারাজের প্রপিতামহ। অতীত দিনের ঘটনা। বিস্মৃতির তলায় তা কবে ডুবে গেছে।

লোকে বলত, সন্ন্যাসী সিদ্ধবাক্ পুরুষ। তাঁর কথা কখনো মিথ্যা হত না।

নানা লোক সেই মহাপুরুষকে দর্শন করতে আসত। কারো কোন কঠিন পীড়া হলে সন্ন্যাসীর কাছে এসে আরোগ্যলাভের ওষুধ প্রার্থনা করত।

সন্ন্যাসী তাদের ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু সব ক্ষেত্রে পারতেন না। অনেক কাকুতি মিনতির পর কখনো কখনো তিনি ওষুধ দিতেন।

অদ্ভুত সেই ওষুধের গুণ, রোগী ভাল হয়ে যেত।

কিন্তু সকলের সেই ওষুধলাভের সৌভাগ্য হত না। অনেকেই ফিরে আসত শূন্য হাতে। তারা বুঝত রোগীর বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হত।

এই সব কারণে সন্ন্যাসীর কথা ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে।

একদিন এক রাজপুরুষ এলেন সন্ন্যাসীর কাছে। তার হাতে একখানি নক্সা।

নক্সা দেখিয়ে বললেন যে, নগর বেষ্টন করে প্রাচীর উঠবে আর নক্সা অনুসারে গুহা ভেঙে দিয়ে প্রাচীর তুলতে হবে।

কিন্তু সন্ন্যাসী গুহা পরিত্যাগ করতে রাজী হলেন না। রাজপুরুষ ফিরে গেলেন।

দিনকয়েক বাদে স্বয়ং মহারাজ এসে দেখা করলেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা মহারাজ আগেই শুনেছিলেন।

তিনি বিনীত কণ্ঠে অনুরোধ জানালেন।

—দেব, আপনি দয়া করে এ স্থান পরিত্যাগ করুন। আপনার বসবাসের জন্য আমি মন্দির গড়িয়ে দেব।

কিন্তু সন্ন্যাসী অটল।

—বৎস, মন্দিরে আমার প্রয়োজন নেই। এই গুহাতে আমি বেশ শান্তিতে আছি।

মহারাজ চিন্তিত হলেন। সন্ন্যাসী বুঝতে পেরে বললেন—আমি জানি তুমি বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে নগর রক্ষার জন্যই প্রাচীর দিতে চাও। বৎস, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি বলছি প্রাচীরের মাঝে এ গুহা তুমি নিশ্চিন্তে রেখে দিতে পার। এর সন্ধান বাইরের কেউ জানতে পারবে না।

মহারাজ তবু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

সন্ন্যাসী পুনরায় বললেন—আমার কথা মিথ্যা হবার নয় মহারাজ। মশকাবতীর কেউ যদি শত্রুসৈন্যকে এ পথের সন্ধান না দেয় তবে এ পথ দিয়ে তোমার রাজ্য কোনদিন আক্রান্ত হবে না।

মহারাজ সেদিন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে ফিরে এসেছিলেন।

মহাপুরুষ সন্ন্যাসীর কথা ব্যর্থ হয় নি।

আজ পর্যন্ত কোন শত্রুপক্ষ এ গুহাপথের সন্ধান পায় নি।

যে প্রাচীন নক্সার কথা লোকে ভুলে গেছে, সেই নক্সাখানা উগ্রসেন কোন উপায়ে হস্তগত করেছিলেন।

উগ্রসেন নক্সাটি আলেকজাণ্ডারের হাতে তুলে দিলেন।

আলেকজাণ্ডার খুশী হলেন নক্সা দেখে।

সেই মুহূর্তে ফিলিপ্পাসের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠালেন গুহা-পথের দিকে। উগ্রসেন তাদের সঙ্গী হলেন।

দুর্ভাগ্য মশকাবতীর! উগ্রসেনের মত দেশদ্রোহীকে সে জন্ম দিয়েছিল।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আবার সংবাদ এল।

পরিখায় বাঁধ দেওয়া সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু প্রাচীর অতিক্রম করা যাচ্ছে না। বিপক্ষ দল প্রাচীরের আড়াল থেকে প্রচণ্ড যুদ্ধ করছে।

সব শুনে আলেকজাণ্ডার নিজেই এগিয়ে এলেন সৈন্যদের পরিচালনা করতে। সম্রাটকে দেখে সৈন্যরাও দ্বিগুণ উৎসাহে মই বেয়ে প্রাচীরে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু কৃতকার্য হল না। অসংখ্য গ্রীক সৈন্য নিহত হতে লাগল।

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

অন্ধকার গলে গিয়ে আকাশের পূর্ব দিকটা ফর্সা হয়ে উঠেছে।

আট

ভোর হয়ে এসেছে।

একটু বাদেই সূর্য উঠবে উদয় দিগন্তে।

মহারাজ পুণ্ডরীকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

—মহারাজ, যবন সেনাকে নগরে ঢুকতে না দিয়ে আমরা সুবিবেচনার কাজই করেছি।

—হ্যাঁ, গুরুদেব। আলেকজাণ্ডার যে এত নীচ তা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। আমাদের বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তিনি রাতের অন্ধকারে আমাদের আক্রমণ করেছেন।

—এর জবাব আমরা ভাল করেই দেব মহারাজ। গতরাত্রের যুদ্ধে গ্রীক সম্রাট মশকাবতীর শক্তির কিছুটা পরিচয় পেয়েছেন।

—আমরা জীবন দেব কিন্তু স্বাধীনতা হারাবনা।

এমন সময় অদূরে কিসের যেন কোলাহল শুনা গেল। নগর বাসীরা এদিকেই ছুটে আসছে। তারা সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত।

ছুটতে ছুটতে একদল লোক মহারাজের কাছে এল।

—মহারাজ সর্বনাশ হয়েছে। শত্রুসৈন্য নগরে ঢুকে পড়েছে।

মহারাজ লাফিয়ে উঠলেন—ঢুকে পড়েছে? অসম্ভব।

পুণ্ডরীক শুধালেন—কোন পথে তারা প্রবেশ করল?

—গুহা পথের মধ্য দিয়ে। আমাদের সৈন্যরা বাধা দিয়েছিল কিন্তু মুষ্টিমেয় সৈন্য তাদের গতিরোধ করতে পারেনি।

গুহা পথ তেমন সুরক্ষিত ছিলনা। কারণ ও পথ দিয়ে শত্রু সৈন্য প্রবেশ করবেনা; এ বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

—কিন্তু গুহা পথের সন্ধান আলেকজাণ্ডারের জানবার কথা নয়। আমাদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

—আপনার অনুমান যথার্থ আচার্যদেব। শ্রেষ্ঠী উগ্রসেন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন!

—উগ্রসেন?

পুণ্ডরীক দেহে অসম্ভব জ্বালা অনুভব করলেন।

—বিশ্বাসঘাতক উগ্রসেন?

মহারাজ বললেন—উগ্রসেনের ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই।

—উগ্রসেন, গ্রীক বাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন মহারাজ।

পুণ্ডরীক তাড়াতাড়ি বললেন—রাজা শীঘ্র এর একটা প্রতিকার কর। তুমি নিজে সসৈন্যে গুহা পথের দিক অগ্রসর হও। এদিকের ব্যবস্থা আমি দেখেছি।

মহারাজ চলে গেলেন।

পুণ্ডরীক আপন মনেই বললেন—না, আর কোন আশা দেখছি না। ভবিতব্য অখণ্ডনীয়। নিয়তির বিধান মানুষ রোধ করতে পারে না।

গ্রীক বাহিনী ততক্ষণে নগরে ঢুকে পরেছে।

মহারাজ কিছুদূর অগ্রসর হতেই দুই দলের মুখোমুখি দেখা হল।

সুরু হল প্রচণ্ড সংগ্রাম।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে যুদ্ধ হল।

অকস্মাৎ একটি বর্শা এসে মহারাজের বুকে বিদ্ধ হল। মহারাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

গ্রীক সৈন্যরা আনন্দে কোলাহল করে উঠল।

মহারাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মশকাবতীর সৈন্যরা দিশাহারা হয়ে পড়ল। চালকহীন যুদ্ধ স্থায়ী হয়না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে লাগল।

—দাঁড়াও, মশকাবতীর বীর সৈন্যগণ দাঁড়াও। পিছনে থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

সকলে তাকিয়ে দেখলেন—রাণী কৃপা দেবী।

মুক্ত কৃপাণ হস্তে অশ্বারূঢ়া রাণী কৃপা দেবী। যেন মূর্তিমতী উষা এসে দাঁড়িয়েছেন।

কৃপা দেবী বললেন—সৈন্যগণ তোমরা বীর। তোমরা মশকাবতীর গৌরব। বিশ্বাসঘাতক যবন সেনা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়। তোমরা তাদের উৎসাদন কর, তোমাদের মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষা কর। তোমরা তোমাদের প্রিয় মহারাজ হারিয়েছ কিন্তু আমি হারিয়েছি আমার স্বামীকে। কাঁদবার সময় এ নয়, শোক প্রকাশের সময় নেই। মহারাজ বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। বীরের কাছে এর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু নেই। তোমরাও তোমাদের মহারাজের সঙ্গী ছিলে। তোমরা কি তোমাদের দেশমাতাকে যবনের হাতে তুলে দিতে চাও? তা যদি না চাও তবে তোমরা অগ্রসর হও। তোমাদের বাহুতে অসীম শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে আঘাত হান শত্রুপক্ষকে। দেখবে জয় তোমাদের অনিবার্য। আর যদি দেবতা বিমুখ হন, কিছু এসে যায়না। আর কিছু না পারি মরতে তো পারব। দেশমাতৃকার বেদীতলে জীবন উৎসর্গ করতে পারব। এর চাইতে বড় ধর্ম আর কিছু থাকতে পারেনা। তোমরা সবাই বল—জয় মশকাবতীর জয়।

—জয় মশকাবতীর জয়।

এক সঙ্গে গর্জে উঠল মশকাবতীর বীর সৈনিকগণ।

তারা রুখে দাঁড়াল মুক্ত অসি হস্তে। রাণী কৃপা দেবী তাদের চালনা করতে লাগলেন।

যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হল। একটু বাদে দেখা গেল গ্রীক সৈন্য পশ্চাদপসরণ করছে।

কৃপা দেবী আবার বললেন—বীরগণ তোমরা এগিয়ে চল। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একজনও জীবিত থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করব। আমরা মরব কিন্তু দাসত্ব বরণ করব না।

—জয় রাণী কৃপা দেবীর জয়।

পুণ্ডরীকে নেতৃত্বে আর :একদল সৈন্য কৃপাদেবীর পাশে এসে দাঁড়াল।

যুদ্ধ চলতে লাগল।

একদিন নয়, দুইদিন নয় দীর্ঘ নয়দিন ধরে যুদ্ধ হল।

আলেকজাণ্ডার জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছেন কিন্তু এমন যুদ্ধ তিনি দেখেননি। একজন মহিলা কতখানি রণ নিপুণ হতে পারেন সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না।

অবশেষে যুদ্ধের নবম দিনে মশকাবতী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল।

মশকাবতীর সৈন্যসংখ্যা ধীরে ধীরে কমে এসেছিল কিন্তু তা সত্ত্বে তারা মনোবল. হারায়নি। পুরুষ বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে আপ্রাণ যুদ্ধ করল নারী বাহিনী।

নিয়মিত যোদ্ধা ব্যতীত দেশের প্রতিটি তরুণ আর তরুণী এগিয়ে এল স্বদেশ রক্ষা করতে। অপটু হাত, রণবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কিন্তু প্রতিজ্ঞায় তারা অটল। দেশকে যবনের হাতে তুলে দেবে না। তার পূর্বে তারা মৃত্যুবরণ করবে।

রাণীর আদেশ দেশে একটি সক্ষম ব্যক্তি বেঁচে থাকা পর্যন্ত সংগ্রাম করতে হবে। একটি যুবক বা যুবতী যেন পরাধীন দেশে বাস করবার জন্য বেঁচে না থাকে। দাসত্বের চাইতে মৃত্যু কাম্য।

সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল মশকাবতীর প্রতিটি লোক।

নবম দিনে দেখা গেল মুষ্টিমেয় কয়েকটি তরুণ তরুণী ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও রাণী তাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু সৈন্যের উপর। কিন্তু সামান্য তৃণখণ্ডের সাহায্যে বন্যার জল প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

রাজপুরীর ভার রয়েছে রাজকুমারী পার্বতীবাঈ-এর উপর। তার সঙ্গী মাত্র পাঁচটি যুবতী। আর মাত্র চতুর্দশ বৎসরের রাজকুমার কিশোর দেব।

পুণ্ডরীক তখনো জীবিত ছিলেন।

অনাহারে আর দুশ্চিন্তায় তাঁর চোখের কোল বসে গেছে। তাঁর চোখের সামনে একে একে সব শেষ হয়ে গেল।

তিনি উন্মাদের মত মন্দিরে গিয়ে ঢুকলেন।

সামনেই দাঁড়িয়ে বিগ্রহ মূর্তি।

পাষাণ মূর্তি—স্থির, নিশ্চল।

পুণ্ডরীক উন্মাদের মত হা-হা করে হেসে উঠলেন। সেই হাসি ঘরময় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

—পাষাণ দেবতা! তোমার মনে এই ইচ্ছা ছিল! এই জন্যই কি তোমার পূজা না দিয়ে একদিনের জন্যও জলস্পর্শ করিনি? এই জন্যই কি মহারাজ তোমার প্রসাদী মাথায় না নিয়ে কোনদিন রাজকার্য সুরু করেন নি? রাণী কৃপাদেবীর অচলা ভক্তির পরিণাম কি এই? তবে তুমি কিসের দেবতা? কেন, কেন তোমার পূজো দেব?

পুণ্ডরীক একে একে পূজার সমস্ত সামগ্রী বাইরে ফেলে দিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন বিগ্রহ মূর্তির কাছে। ভাবলেন বিগ্রহ মূর্তিও ছুঁড়ে ফেলে দেবেন বাইরে। কিন্তু পারলেন না। আজন্মের সংস্কার তাঁর হাত চেপে ধরল।

তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে।

দ্রুতপদক্ষেপে তিনি রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন।

একটি বৃহৎ কর্তব্য তখনো তাঁর বাকী ছিল। তার শেষ কর্তব্য।

প্রাসাদে এসে তিনি কিশোরদেবকে নিয়ে বাইরে এলেন।

রাজপুরীর পিছনে নগর প্রাকারের কাছে এসে বললেন—কুমার, সব শেষ হয়ে গেছে। এবার তুমি পালাও।

কিশোরদেব ফিরে দাঁড়ালেন।

—অসম্ভব। বাবা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। মা এখনো যুদ্ধ করছেন। আমিও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করব। জানি কিছুই করতে পারব না কিন্তু মরতেতো পারব।

—না কুমার, তা হয়না। তোমাকে পালাতে হবে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য। আজ আমরা পরাজিত কিন্তু তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। জীবনে সুখভোগ করবার জন্য বাঁচতে বলছিনা। তুমি বেঁচে থাকলে একদিন এর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পাবে। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের তুমি শাস্তি দেবে এই আশাতেই তোমাকে বাঁচতে বলছি।

দূরে কোলাহল শোনা গেল।

রাণী কৃপাদেবী নিহত হয়েছেন।

গ্রীক সৈন্য এগিয়ে আসছে রাজপুরীর দিকে।

—কুমার আর বিলম্ব করোনা। তবে আর কোন আশা থাকবে না। শত্রু সৈন্য এসে গেলে পালাবার আর সুযোগ পাবে না। তুমি যাও।

কিশোরদেব কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

—না কুমার, কান্না নয়। বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে রাখো। তোমার পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যার জন্য যারা দায়ী তাদের তুমি ক্ষমা করোনা।

প্রকারের বাইরে একটি বড় বটগাছ ছিল। তারই একটি শাখা এসে প্রাচীরের উপর পড়েছে।

—এই গাছ বেয়ে তুমি প্রাচার পার হয়ে নিচে নেমে যাও। তারপর ঢুকে পড়বে গভীর অরণ্যে। কেউ তোমার গতিবিধির সন্ধান জানবে না। যাও এবার।

কিশোরদেব পুণ্ডরীককে প্রণাম করলেন।

—যাবার আগে প্রতিজ্ঞা করে যাও যে তুমি এর প্রতিশোধ নেবে। ভুলে যেয়ো না—বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিলেই তোমার পিতামাতার আত্মা শান্তি লাভ করবে।

—আমি শপথ করছি। যদি জীবিত থাকি তবে এর প্রতিশোধ অবশ্যই নেব।

পুণ্ডরীকের মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

—এবার তুমি যাও কুমার। আশীর্বাদ করি তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

কিশোরদেব গাছ বেয়ে দ্রুতগতিতে নগর-প্রাকার পার হয়ে নিচে নেমে গেলেন।

পুণ্ডরীক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে পার্বতীবাঈ-এর কাছে।

গ্রীক সৈন্যরা তখন নগর লুঠ করতে ব্যস্ত। কোন গৃহেই বাধা দেবার কেউ নেই। এমন একজন যুবক বা যুবতী নেই যে তাদের বাধা দেবে। গৃহে গৃহে কেবল অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর শিশুরা।

গ্রীক সৈন্যরা ইচ্ছামত অনায়াসে লুঠ করছে। তারপর ঘর দোরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

একদল গ্রীক রাজপ্রাসাদের সামনে এসে উপস্থিত হল। তাদের সঙ্গে উগ্রসেন আর হস্তী।

পুণ্ডরীকের সমস্ত কর্তব্য শেষ হয়েছিল। এবার তিনি নিশ্চিন্তে মরতে পারেন।

তিনি এগিয়ে এসে বাধা দিলেন গ্রীকদের।

একটি তীর এসে লাগল তাঁর বুকে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

পার্বতীবাঈ তাঁর পাঁচজন সহচরী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসৈন্যের উপর।

উগ্রসেন পার্বতীবাঈকে দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন—ওই যে রাজকুমারী পার্বতীবাঈ। ওকে তোমরা হত্যা করো না; জীবিত অবস্থায় রাজকুমারীকে বন্দী করতে চাই।

একে একে সহচরী পাঁচজন নিহত হল। সামান্য পাঁচটি যুবতীকে হত্যা করতে গ্রীকদের হাত একটুও কাঁপল না।

বাকী রইলেন শুধু পার্বতীবাঈ।

একজন গ্রীক সৈন্য এগিয়ে এল পার্বতীবাঈকে বন্দী করতে। কিন্তু রাজকুমারীর অসি মুহূর্তের মধ্যে ঝলসে উঠল। গ্রীক সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু একা পার্বতীবাঈ কতক্ষণ আত্মরক্ষা করবেন?

যখন দেখলেন যে আর কোন উপায় নেই, ধরা পড়তেই হবে, তখন কটিবন্ধ থেকে একটি ছুরি টেনে বার করলেন। নিমেষের মধ্যে সেই ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না।

একজন গ্রীক সৈনিক পার্বতীবাঈ-এর হাত ধরে ফেলল। হাত থেকে খসে ছুরি মাটিতে পড়ে গেল। প্রবল উত্তেজনায় পার্বতীবাঈ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

॥ নয় ॥

পার্বতীবাঈ-এর জ্ঞান ফিরল অনেকক্ষণ বাদে।

দেখলেন একটি কক্ষে সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর শুয়ে আছেন তিনি। কক্ষটি ছোট কিন্তু সুসজ্জিত। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের কোন

অভাব নেই আর সব কিছুর মধ্যেই যেন একটি সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই অপরিচিত স্থানে কেমন করে তিনি এলেন, অনেক ভেবেও তা মনে করতে পারলেন না পার্বতীবাঈ।

মনে পড়ল তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। একজন গ্রীক সৈনিক তার হাত ধরে ফেলেছিল। পরে তিনি মূর্চ্ছা যান। তারপর?

পার্বতীবাঈ মুর্চ্ছিত হয়েছিলেন।

উগ্রসেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন পার্বতীবাঈকে।

—জল, কেউ একটু জল নিয়ে এস।

উগ্রসেনের কথা শুনে হো হো শব্দে হেসেছিলেন হস্তী। অদ্ভুত সেই হাসি।

—উগ্রসেন অত বিচলিত হয়োনা। ভাবি শেঠ পত্নী একটু বাদেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমি বলি কি, এই মুর্চ্ছিত অবস্থাতেই তাকে তোমার ঘরে নিয়ে চল। তারপর তোমার শুশ্রূষা পেলেই তিনি আরাম বোধ করবেন।

—কিন্তু!

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই উগ্রসেন। মূর্চ্ছা ভাঙলে নিয়ে যেতে আরও অসুবিধা হবে। কারণ, সহজে তিনি তোমার গৃহে যেতে চাইবেন বলে আমার মনে হয়না।

—সহজে যেতে না চান, তবে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব।

অকস্মাৎ কে যেন খিল খিল করে হেসে উঠল। সে হাসি বামাকণ্ঠের।

সকলে তাকিয়ে দেখলেন একজন সুন্দরী তরুণী অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সুন্দরীর বয়স বেশী নয় তবে পার্বতীবাঈ-এর চাইতে কিছু বেশী। অনুমানে পঁচিশ ছাবিবশ বলে মনে হয়। গড়ন সুন্দর, রঙ্ ফর্সা;

হাসলে গালের টোল দুটিতে বড় সুন্দর দেখায়। চোখ দুটি টানা টানা, তাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ।

হাসতে দেখে উগ্রসেন রুষ্ট হলেন।

—কে তুমি? অমন করে হাসছ কেন?

সুন্দরী আবার ললিত কণ্ঠে হেসে উঠল।

—হাসছি আপনাদের বীরত্ব দেখে।

হস্তী হুঙ্কার করে উঠলেন।

—কি বলতে চাও তুমি?

সুন্দরী মোটেই ভয় পেলনা।

—একজন স্ত্রীলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার সেই অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাকে আপনাদের বিবরে নিয়ে যেতে চাইছেন। এমন বীরত্বের কথা শুনলে মড়া মানুষ পর্যন্ত হেসে উঠবে।

উগ্রসেন বুঝলেন যে তরুণী অতিশয় বুদ্ধিমতী। এর সাহায্য পেলে তার অনেক সুবিধা হবে। স্থির করলেন অর্থের লোভ দেখিয়ে তরুণীকে হাত করবেন।

—এই অসুস্থ স্ত্রীলোকটি কে তা তুমি জান?

তরুণী মাথা নাড়ল।

—আজ্ঞে না, জানিনা।

—ইনি মশকাবতীর রাজকুমারী পার্বতীবাঈ।

—হতে পারেন। রাজকুমারীকে আমি কোনদিন দেখিনি। তাছাড়া রাজবাড়ির খবর আমাদের জন্য নয়। তবে এটুকু বুঝেছি যে রাজকন্যা হলেও ইনি একজন স্ত্রীলোক এবং বর্তমানে অসুস্থ।

—তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর তবে তোমাকে প্রচুর অর্থ দেব।

—কি করতে হবে?

উগ্রসেনের ক্ষত চিহ্নটা যেন লাল হয়ে উঠল।

—সে কথা তোমাকে পরে বলব। আগে রাজকুমারীকে সুস্থ করে তোল।

তরুণী উগ্রসেনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

—বুঝেছি, আর কিছু বলতে হবেনা।

—বুঝেছ, কি বুঝেছ শুনি ?

তরল কণ্ঠে সুন্দরী উত্তর দিল—আমিও সে কথা পরে বলব। আপনি কোনদিন হাতি শিকার করেছেন অথবা শিকার করতে দেখেছেন ?

উগ্রসেন তার কথার কোন অর্থ বুঝতে পারলেন না।

—হাতি শিকারের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ আছে ?

—আছে। হাতি শিকার করতে হলে হাতির সাহায্য নিতে হয়। কেবল বল প্রয়োগে হয়না। বুঝেছেন ?

উগ্রসেন এবার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন।

—তুমি বুদ্ধিমতী। সবই বুঝেছ দেখছি।

—আমাকে কি পুরস্কার দেবেন ?

—যা চাইবে। যত অর্থ চাও দেব।

—বেশ, আমি দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমাকে মাত্র সাতটি দিন সময় দিন। আশা করি এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই আফিং খাইয়ে আপনার চিড়িয়াকে বশ করাতে পারব। তখন আপনি ইচ্ছামত তাকে সোনার খাঁচায় পুরতে পারবেন।

—ঠিক বলছ ?

—বেশতো, পরীক্ষা করে দেখুন।

—তোমার নাম কি ?

—আমাকে আপনি চম্পা বলেই ডাকবেন।

—চম্পা, বেশ সুন্দর নাম। তুমি চম্পাই বটে।

—থাক, নাম মাহাত্ম্য পরে ভাববেন। এখন রাজকুমারীকে আমার বাড়ি নিয়ে চলুন। বাড়ি আমার নিকটেই। বেশী দূর যেতে হবে না। আগে তাকে সুস্থ করে তুলি।

পার্বতীবাঈকে নিয়ে আসা হল চম্পার বাড়িতে। একটি সুসজ্জিত পালঙ্কে তাকে শুইয়ে দেওয়া হল।

যাবার সময় উগ্রসেন চম্পার হাতে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন —এখন তুমি এগুলো রাখ। পরে তোমাকে আরও দেব।

চম্পা হাত পেতে সে মুদ্রা গ্রহণ করল।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কাজে অবহেলা হবেনা।

—সে কথা আমি জানি। প্রথম দর্শনেই আমি বুঝেছি যে তুমি কাজের লোক। তবে তোমার সুবিধার জন্য বাড়ির দরজায় জনাদুই প্রহরী রেখে গেলাম। তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

চম্পা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

—বিশ্বাস করতে পারছেন না বুঝি? বেশতো, থাকুক আপনার প্রহরী। আমার কোন আপত্তি নেই। এতে বরং সুবিধাই হবে আমার। প্রয়োজন মত আপনাকে সংবাদ পাঠাবার জন্য হাতের কাছে লোক রইল।

—এবার তবে চলি। আবার এসে সংবাদ নেব।

উগ্রসেন সদলবলে চলে গেলেন।

চম্পা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। হাতে তার বিরাট দায়িত্ব; সেই দায়িত্ব কেমন করে সম্পন্ন করবে তাই সে ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরল পার্বতীবাঈ-এর।

—আমি কোথায়?

চম্পা নিকটেই ছিল।

—রাজকুমারী এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি?

—তুমি কে?

—আমি চম্পা।

—আমি কোথায়?

—আমার বাড়িতে।

—এখানে কেমন করে এলাম?

—শ্রেষ্ঠী উগ্রসেন আপনাকে রেখে গেছে।

পার্বতীবাঈ-এর মুখখানা ঘৃণায় ভরে উঠল।

চম্পা একবাটি গরম দুধ নিয়ে এল

—এটুকু খেয়ে ফেলুন রাজকুমারী। তবেই সুস্থ বোধ করবেন।

পার্বতীবাঈ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

—না, খেতে চাইনা আমি। আমি মরতে চাই। আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পার?

—ছেলেমানুষী করবেন না রাজকুমারী। দুধটুকু খেয়ে ফেলুন। আগে সুস্থ হয়ে উঠুন, পরে ওসব কথা চিন্তা করবেন।

—তুমি জাননা চম্পা কেন উগ্রসেন আমাকে বাঁচিয়ে তুলতে চায়।

—জানি রাজকুমারী।

—কি জান?

—তিনি আপনাকে বিয়ে করতে চান।

—তবু তুমি আমাকে বাঁচতে বলছ?

—তবু বলছি রাজকুমারী। কিছু করতে হলে আগে বাঁচতে হয়। তাই আপনার বাঁচা প্রয়োজন।

—কিন্তু আমিতো কিছু চাই না।

—চান।

পার্বতীবাঈ বিস্মিত হয়ে চম্পার মুখের দিকে তাকালেন।

—চাই, কি চাই আমি? উগ্রসেনের মত একটা ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতককে বিয়ে করতে?

চম্পা কি যেন একটু ভাবল। পরে নিচু গলায় বলল—সব কিছু বলার এখনো সময় হয়নি রাজকুমারী। আগে দুধটুকু খেয়ে ফেলুন, পরে সব বলব। তবে এটুকু বিশ্বাস করুন যে আমি আপনার মঙ্গল চাই।

পার্বতীবাঈ আর কোন কথা বললেন না। হাত বাড়িয়ে দুধের

বাটিটা চম্পার হাত থেকে গ্রহণ করলেন। দুধটুকু পান করে শূন্য বাটিটা চম্পার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—চম্পা, আমি কি বন্দিনী?

চম্পা খানিক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে বলল—সে কথা আমিও জানিনা রাজকুমারী। তবে যতদূর মনে হয় আপনি বন্দিনী কারণ আমার গৃহের দরজায় দুজন প্রহরী নিযুক্ত আছে।

পার্বতীবাঈ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন।

—আপনি বিশ্রাম করুন রাজকুমারী। আমি আপনার আহারের ব্যবস্থা করে আসছি।

চম্পা চলে গেল।

পার্বতীবাঈ গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

কে এই চম্পা? কি তার উদ্দেশ্য?

পার্বতীবাঈ আপন মনেই ভাবতে থাকেন।

সে আজ বন্দিনী।

কি বিচিত্র তার জীবন।

জন্ম হয়েছিল ছায়াশীতল সুন্দর একটি গ্রামে। পল্লীবালা সে কিন্তু জন্মভূমির কথা কিছুই মনে পড়েনা তার। জননীকেও না। কিছু কিছু মনে পড়ে পিতার কথা। তাও অস্পষ্ট, আবছা আবছা। চার বছরের শিশুর মনে থাকার কথা নয় তবু যেন মনে পড়ছে সেই দীর্ঘ ঋজু চেহারাটি। সুন্দর, সুপুরুষ।

অকস্মাৎ তার জীবনের পট পরিবর্তন হল। পৈতৃক ভূমি রাঙা হল পিতার রক্তে। পিতৃগৃহ ভস্মীভূত হল অত্যাচারের আগুনে।

পিতৃগৃহ! ভাবতেও বিস্ময় লাগে পার্বতীবাঈ-এর। পিতৃগৃহ তার ছিল নাকি কোনদিন! মনেও পড়েনা।

পুণ্ডরীক তাকে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। কঙ্কণা হল পার্বতীবাঈ।

কঙ্কণা—কি সুন্দর নাম। কে রেখেছিল তার এই সুন্দর নামটি?

বাবা না মা? কিন্তু সে নাম কোথায় তলিয়ে গেছে অতলে। আজ সে পার্বতীবাঈ। রাজকুমারী পার্বতীবাঈ।

রাজপ্রাসাদে তার সুখের অন্ত ছিলনা। রাণী কৃপাদেবীর স্নেহ মমতা তাকে ঘিরে রেখেছিল সর্বক্ষণ। মায়ের অভাব বুঝতেও পারেনি সে। মা—সে কি কৃপাদেবীর চাইতে আরও বেশী কিছু?

কিন্তু সর্বনাশী সে। কোন সুখ তার কপালে লেখা নেই।

জীবনের স্বপ্ন ভাল করে দেখার আগেই সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে বার বার।

নীড় বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল সে। পুষ্করাবতীতে গিয়ে মনের মত গড়বে একটি নীড়, এই ছিল তার স্বপ্ন।

কিন্তু হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। ওলটপালট হয়ে গেল সমস্ত কিছু।

আজ সে বন্দিনী।

চম্পা ফিরে এল।

পার্বতীবাঈ বললেন—চম্পা জানিনা তুমি কে আর কি তোমার অভিপ্রায়। তুমি স্ত্রীলোক, আশা করি আমার মনের ব্যাথা তুমি বুঝবে।

চম্পার কণ্ঠে সহানভূতির স্বর।

—আপনি অত বিচলিত হবেন না রাজকুমারী।

—আমি আজ বন্দিনী চম্পা।

—সে কথা সত্য, তবে ইচ্ছা করলেই তো মুক্তি পেতে পারেন।

—কি উপায়ে?

—উগ্রসেনকে বিয়ে করুন।

পার্বতীবাঈ চিৎকার করে উঠলেন।

—সাবধান চম্পা।

চম্পা বিনীত কণ্ঠে বলল—আমার অপরাধ নেবেন না রাজকুমারী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

—বল।

—আপনি উগ্রসেনকে ঘৃণা করেন, তাই না?

পার্বতীবাঈ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

—করব না? সে আমাদের দেশে কতবড় সর্বনাশ করেছে, তা তুমি জান না।

—রাজনীতি আমি বুঝিনা রাজকুমারী।

—আমাদের দেশকে বিদেশীর হাতে তুলে দিয়েছে। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে। সে দেশদ্রোহী। তারই জন্য আজ আমি সর্বহারা।

চম্পা ধীরে ধীরে বলল—তাই যদি হয়, তবে তার প্রতিহিংসা গ্রহণ করুন।

—তা আমিও চাই কিন্তু কেমন করে সম্ভব-হবে?

—জীবন তুচ্ছ রাজকুমারী। জীবনের কী মূল্য আছে? প্রতিহিংসা নেবার জন্য না হয় সে জীবন উৎসর্গ করলেন।

পার্বতীবাঈ চম্পার মুখে দিকে স্থির নেত্রে তাকালেন।

—কি বলতে চাও তুমি?

চম্পা পার্বতীবাঈ-এর খুব কাছে এগিয়ে এল।

তারপর নিম্নকণ্ঠে বলল—উগ্রসেনকে হত্যা করে প্রতিহিংসা গ্রহণ করুন। রাজকুমারী আমি রাজনীতি বুঝিনা কিন্তু প্রতিহিংসা বুঝি।

পার্বতীবাঈ চমকে উঠলেন।

চম্পা পুনরায় বলল—উগ্রসেনকে বিয়ে করলে তাকে নিভৃতে পাবার সুযোগ পাবেন। তখন পারবেননা রাজকুমারী একটি বিষমাখা ছুরি তার বুকে আমূল বসিয়ে দিতে?

এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেল।

একজন পরিচারিকা নানা প্রকার ভোজ্য দ্রব্য নিয়ে ঘরে ঢুকল।

চম্পা বলল—আসুন রাজকুমারী আপনার আহারের ব্যবস্থা হয়েছে।

পার্বতীবাঈ খেতে বসলেন কিন্তু আহারে রুচি নেই।

সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য তার কাছে বিস্বাদ মনে হতে লাগল।

তিনি চম্পার কথাগুলো ভাবতে লাগলেন।

কি চায় সে? তার উদ্দেশ্য কি?

চম্পা—রহস্যময়ী নারী চম্পা।

বিকালের দিকে উগ্রসেন পুনরায় উপস্থিত হলেন চম্পার গৃহে।

সঙ্গে হস্তী আর ফিলিপ্পাস।

চম্পা সাদর সম্ভাষণ জানাল।

—আসুন শ্রেষ্ঠী।

উগ্রসেন উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন পার্বতীবাঈ?

—এখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

—কেমন মনে হচ্ছে তোমার?

চম্পার চোখে মুখে হাসির জোয়ার খেলে গেল।

—সংবাদ শুভ। আপনি অধৈর্য হবেন না। বলেছিতো দিন সাতেক সময় লাগবে। রাজকুমারীর মনের উপর দিয়ে একটি বিরাট ঝড় বয়ে গেছে। চোখের সামনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিহত হয়েছে তার প্রতিটি আপনজন। সামলে উঠবার জন্য তাকে একটু সময় দিতে হবে।

হস্তী অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

—তোমাদের ওসব মনস্তত্ব আমি বুঝিনা। একটা সামান্য মেয়েকে বশ করতে কতক্ষণ লাগে? স্বেচ্ছায় না যায় জোর করে ধরে নিয়ে যাও। দুদিন একটু ঝমেলা হবে পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

চম্পা হস্তীকে থামিয়ে দিয়ে বলল—নারীর মন বড় বিচিত্র।

জোর করে তাকে বশ করা যায়না। সে কথা আপনি বুঝবেন না হস্তী।

—বুঝতে চাইও না আমি। হস্তী বললেন—কি ফিলিপ্লাস, কোন কথা বলছনা যে। তোমার কি মনে হয়?

ফিলিপ্লাসের কণ্ঠে নির্লিপ্ততার সুর।

—আমি সৈনিক। আমি যুদ্ধ বিদ্যা বুঝি, নারী চরিত্র বুঝিনা। উগ্রসেন বললেন—চল চম্পা, একবার দেখে আসি পার্বতীবাঈকে।

—চলুন।

সকলে চম্পাকে অনুসরণ করলেন।

পার্ব্বতীবাঈ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

ঘরে ঢুকে উগ্রসেন বললেন—এখন কেমন আছ পার্বতীবাঈ।

পার্বতীবাঈ কোন জবাব দিলেন না। প্রবল ঘৃণায় তার ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ চাপ।

এক সময় পার্বতীবাঈ ফিলিপ্লাসকে বললেন—শুনেছি গ্রীস একটি সুসভ্য দেশ। আপনি সেই দেশেরই একজন দেশভক্ত সৈনিক।

ফিলিপ্লাস অভিবাদন করে জবাব দিলেন—আপনার অনুমান যথার্থ রাজকুমারী।

—সৈনিকের কর্তব্য সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই সচেতন।

—নিশ্চয়। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

পার্বতীবাঈ এর কণ্ঠ গম্ভীর।

—কিন্তু আপনার কাজ দেখে আমার সন্দেহ হয় গ্রীক সৈনিক যে হয় আপনি সৈনিকের কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আর তা না হলে কোন বিশেষ স্বার্থের জন্য স্বেচ্ছায় কর্তব্য কর্মে অবহেলা করছেন।

ফিলিপ্লাসের মুখখানা থমথম করতে লাগল।

—আমার বিরুদ্ধে রাজকুমারী কি অভিযোগ জানতে পারি কি?

—আমি এই রাজ্যের রাজকুমারী। আমার একটি রাজকীয় মর্যাদা আছে, একথা বোধহয় আপনি অস্বীকার করেন না।

—আপনার কোনরূপ অমর্যাদা আমি করিনি রাজকুমারী।

পার্বতীবাঈ এবার দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছে এ কথা আমি জানি। যে কারণেই হোক যুদ্ধে আমরা পরাজিত এবং বর্তমানে আমি বন্দিনী। আমরা পরাজিত হয়েছি গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের নিকটে। সৈনিক হিসাবে আপনার কর্তব্য ছিল আমাকে আপনাদের সম্রাটের নিকট উপস্থিত করা। যুদ্ধের রীতি অনুসারে তিনি আমার যে ব্যবস্থা করতেন তা আমি সানন্দচিত্তে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আপনি তা না করে কার আদেশে আমাকে এখানে আবদ্ধ করে রেখেছেন গ্রীক সৈনিক?

হস্তী তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে উঠলেন।

—একজন বন্দিনীর কাছ থেকে আমরা কোন উপদেশ শুনতে চাই না।

পার্বতীবাঈ এর চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

—রাজনন্দিনী যখন সম্রাটের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা কয় তখন একজন বিশ্বাসঘাত তার মধ্যে কথা বলতে আসে কোন সাহসে?

হস্তী চুপ করে গেলেন।

ফিলিপ্পাসও গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

—আপনি মহামান্য সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চান?

—সে কথা স্বতন্ত্র। আপনার কর্তব্য কি আমি শুধু তাই জানতে চাই।

—আপনার অভিযোগ আংশিক সত্য একথা আমি স্বীকার করছি রাজকুমারী। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাই আপনার শুশ্রূষার জন্য এখানে আনা হয়েছিল।

—আমাকে অনায়াসে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে পারতেন।

ফিলিপ্পাস চুপ করে রইলেন।

পার্বতীবাঈ পুনরায় বললেন—গ্রীক সৈনিক, দেখে খুশী হলাম যে আপনি সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। যাই হোক আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আপনি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।

ফিলিপ্পাস সম্মত হল।

—আশা করি আপনি এখন সুস্থ বোধ করছেন। আজই আপনাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাব।

পার্বতীবাঈ হস্তী আর উগ্রসেনের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন—এই বন্য শৃগাল দুটো নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যাবে না?

উগ্রসেন ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তার কপালের চিহ্নটা গভীর ভাবে লাল হয়ে উঠল। মনে হল তিনি এক্ষুণি ঝাপিয়ে পড়বেন পার্বতীবাঈ এর উপর।

ফিলিপ্পাস অসি কোষমুক্ত করে বাধা দিলেন উগ্রসেনকে।

—সাবধান, রাজকুমারীর কোনরূপ অমর্যাদা আমি সহ্য করব না। বন্দিনী হলেও ইনি রাজকুমারী একথা ভুলে যেও না।

উগ্রসেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হস্তী দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন।

চম্পা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়েছিল ঘরের এক কোনে।

এবারে বলল—গ্রীক সৈনিক, আপনার অনুমতি পেলে আমিও রাজকুমারীর সঙ্গিনী হতে চাই।

ফিলিপ্পাস সম্মত হলেন।

একটু বাদেই তারা রওনা হলেন গ্রীক শিবিরের দিকে।

॥ দশ ॥

গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার মশকাবতীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। ক্ষুদ্র মশকাবতী তার সামান্য শক্তি নিয়ে দুর্ধর্ষ গ্রীক বাহিনীর গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি।

কদিন আগেও স্বয়ং গ্রীক-সম্রাট মশকাবতীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু নিজের হাতেই তিনি সেই সৌন্দর্য বিনষ্ট করেছেন। এর প্রয়োজন হয়েছিল। ভারতবর্ষ জানুক গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার বীর। তাঁর সঙ্গে চাতুরী খেললে তিনি ক্ষমা করেন না। প্রবল শক্তিধর তিনি, তাই বিজয়লক্ষ্মী তাঁরই গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছেন।

যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছেন কিন্তু কই খুশী হতে পারছেন না তো! একটা কাঁটা তাঁর মনের কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে বিঁধছে। কেন এই দুর্বলতা তাঁর?

আলেকজাণ্ডারের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন সেনাপতি সেলিউকস।

—সম্রাট! আপনার অনুমতি পেলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

—বলুন সেনাপতি, সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।

—মশকাবতী জয় করে সম্রাট যেন খুশী হতে পারেন নি।

—কিসে বুঝলেন?

—সম্রাট! আপনার পাশে দাঁড়িয়ে অনেক যুদ্ধ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই তো সেদিনও পারস্য-সম্রাট ড্যারিয়সকে আমরা পরাজিত করেছি। সেই যুদ্ধ জয়ের পরে সম্রাটের মনে যে উল্লাস দেখেছিলাম, আজ তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

আলেকজাণ্ডার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন—আমরা কি এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছি সেনাপতি?

সেলিউকস মৃদু হাসলেন।

—সম্রাটের সংশয়ের কারণ বুঝতে পারছি না।

আলেকজাণ্ডারের চোখে যেন বেদনার ছাপ ফুটে উঠল।

—না সেনাপতি, আমরা জয়লাভ করতে পারি নি। এই যুদ্ধে আমরা হেরে গিয়েছি।

সেলিউকস আলেকজাণ্ডারের কথা বুঝতে পারলেন না। তিনি বিস্মিত নেত্রে সম্রাটের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আলেকজাণ্ডার পুনরায় বললেন—সেনাপতি এই যুদ্ধে এক অদ্ভুত এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। অবিশ্বাস্য এই অভিজ্ঞতা অথচ সম্পূর্ণ সত্য। না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। জীবনে যুদ্ধ অনেক করেছি, জয়ীও হয়েছি, কিন্তু ভারতবর্ষে না এলে যুদ্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

সেলিউকস নীরব।

আলেকজাণ্ডার এবার প্রশ্ন করলেন—এই যুদ্ধে আমরা কতজন শত্রুসৈন্য বন্দী করেছি সেনাপতি?

—একজনও নয়, সম্রাট।

—এখানেই আমরা পরাজিত হয়েছি সেনাপতি।

—বন্দী করার সুযোগ আমরা পাইনি সম্রাট। তারা সকলেই নিহত হয়েছে। মশকাবতীর সৈন্যসংখ্যা ছিল নগণ্য। সৈন্যরা নিহত হবার পর যারা যুদ্ধ করতে এসেছিল তারা যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। সাধারণ নাগরিকরা যদি যুদ্ধ করতে আসে তবে এ রকম পরিণাম অবশ্যম্ভাবী।

আলেকজাণ্ডার বললেন—ভুল, সেনাপতি, আপনি ভুল পথে বিচার করছেন। আপনি বিচক্ষণ, তবু বলছি এই যুদ্ধের একটি অতি উজ্জ্বল দিক আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

—কি সম্রাট ?

আলেকজাণ্ডারের কণ্ঠ গম্ভীর।

—শুধু যুদ্ধই দেখলেন সেনাপতি! দেখেন নি ভারতবাসীর দেশপ্রেম ? পূর্বে শুনেছিলাম যে জন্মভূমিকে ভারতবাসীরা মাতৃ-জ্ঞানে পূজা করে। এবারে বুঝলাম যে সে কথা কতখানি সত্য। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রতিটি নাগরিক দেশের জন্য হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারে, এই সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। বলতে লজ্জা নেই সেনাপতি যে একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে এই মহিমাময় আত্মত্যাগ সম্ভব হত না। যুদ্ধে তারা প্রাণ দিয়েছে কিন্তু মান দেয় নি। একজনও বন্দী হয় নি আমাদের হাতে। বন্দীত্ব বরণ করার আগে সারা মৃত্যুকে বরণ করেছে হাসিমুখে। তাদের এই গৌরবের কাছে আমরা সম্পূর্ণভাবে হেরে গিয়েছি সেনাপতি।

সেলিউকস নীরবে আলেকজাণ্ডারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আলেকজাণ্ডার পুনরায় বললেন—সেনাপতি আরও একটি ছবি দেখেছি এই যুদ্ধে—যা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।

—কি সম্রাট ?

—ভারতীয় নারীর অপূর্ব শৌর্য। রাণী কৃপাদেবীর বীরত্ব আর তেজস্বীতা। কি দুর্জয় বিক্রমে তিনি সৈন্যচালনা করেছিলেন তা আমি লক্ষ্য করেছি সেনাপতি। আমি জয়ী তবু তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে মাথা নত করছি।

এমন সময় ফিলিপ্পাস প্রবেশ করলেন।

সঙ্গে পার্বতীবাঈ আর চম্পা।

আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন।

—কি সংবাদ ফিলিপ্পাস ?

ফিলিপ্পাস অভিবাদন করে বললেন—সম্রাট ইনি মশকাবতীর

রাজকুমারী পার্বতীবাঈ। আমরা তাঁকে বন্দী করেছি।

আলেকজাণ্ডার হাসলেন। বিচিত্র হাসি।

—এই যুদ্ধে মাত্র একজনকেই আমরা বন্দী করেছি ফিলিপ্পাস, আর তিনি একজন যুবতী।

—রাজকুমারী পাঁচজন সহচরী নিয়ে আমাদের আক্রমণ করেছিলেন। তার সঙ্গিনীরা সকলেই নিহত হয়েছেন। রাজকুমারীও আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। তার আগেই আমরা বন্দী করেছি।

আলেকজাণ্ডার পার্বতীবাঈকে বললেন—রাজকুমারী আপনি মুক্ত।

পার্বতীবাঈ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন—আমি মুক্তি চাইনা গ্রীক সম্রাট। আপনি আমাকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিন। বিদেশীর পদানত হয়ে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। তাছাড়া সিংহীকে বন্দী করে, তার হাত পা বেঁধে একটা লুব্ধ শৃগাল লেলিয়ে দেবেন, সে অপমানের চাইতে মৃত্যুই অধিকতর কাম্য।

আলেকজাণ্ডারের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল।

—ফিলিপ্পাস, রাজকুমারীর এই অভিযোগের কারণ কি?

ফিলিপ্পাস নতমস্তকে ধীর কণ্ঠে বললেন—শ্রেষ্ঠী উগ্রসেন রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের কণ্ঠ তেমনি গম্ভীর।

—উগ্রসেনকে সংবাদ পাঠান। আমি তার সাক্ষাৎ চাই।

এই পরিস্থিতির ফলে ইতিহাসের চাকা কোন দিকে যেত ঠিক ছিলনা কিন্তু অকস্মাৎ একটি নূতন ঘটনা ঘটল।

দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের। আকাশে আবার কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠল।

একজন গ্রীক সৈন্য প্রবেশ করল।

সঙ্গে একজন বন্দী।

গ্রীক সৈন্য সম্রাটকে কুর্ণিশ করে বলল—সম্রাট, এই বন্দী একজন শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। আমাদের সন্দেহ হওয়ায় তাকে বন্দী করেছি। এর দেহ খানাতল্লাশ করে একটি চিঠি উদ্ধার করেছি। এই সেই চিঠি।

সৈনিক একটি চিঠি আলেকজাণ্ডারের হস্তে অর্পণ করল।

গ্রীক সম্রাট চিঠিখানা পড়লেন।

চিঠি লিখেছেন অস্তক রাজ্যের রাজা।

ফিলিপ্পাস প্রথম যেদিন বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে মশকাবতীর মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সেইদিন রাত্রে দুজন পত্রবাহক দুটি গোপন পত্র নিয়ে দুদিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল। একজন অস্তক রাজ্যে, অপরজন পুষ্করাবতীতে।

মশকাবতীর পত্র পড়ে অস্তকরাজ আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেবার প্রস্তাব অনুমোদন করে পত্রের জবাব পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে বিদেশীকে প্রতিরোধ করতে তিনি সর্বশক্তি নিয়ে মশকাবতীর পাশে এসে দাঁড়াবেন। আলেকজাণ্ডারকে এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে তাঁর পররাজ্য গ্রাসের লিপ্সা চিরদিনের মত অন্তর্হিত হয়।

কিন্তু এত দ্রুত সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল যে সেই পত্র মশকাবতীতে পৌঁছুবার আগেই যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল এবং মশকাবতী পরাজিত হল।

অস্তকরাজের সেই পত্রসহ পত্রবাহক বন্দী হয়ে গ্রীক শিবিরে আনীত হয়েছে।

বন্দী ঢুকেই দেখতে পেল পার্বতীবাঈকে।

সে পার্বতীবাঈকে অভিবাদন করল।

—আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন রাজকুমারী।

গ্রীক সৈন্য বলল—সম্রাটকে অভিবাদন কর বন্দী।

উত্তপ্ত কণ্ঠে বন্দী বলল—সেকেন্দার শাহ্ তোমাদের সম্রাট হতে

পারেন কিন্তু আমার কাছে পররাজ্যগ্রাসী একজন দস্যুছাড়া আর কিছুই নয়। দস্যুর নিকট আমি মাথা নত করিনা।

সেনাপতি সেলিউকস ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন।

—বন্দী, সাবধান।

বন্দীর মুখে ব্যাঙ্গের হাসি।

—চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ নেই সেনাপতি। রক্ত চক্ষু দেখিয়ে উগ্রসেন আর হস্তীর মত বিশ্বাসঘাতকদের নিরস্ত করা চলে কিন্তু আমার দেহ অন্য ধাতুতে গড়া।

আলেকজাণ্ডার এতক্ষণ নীরবে সমস্ত লক্ষ্য করছিলেন। এবার রোষদীপ্ত কণ্ঠে বললেন—বন্দী তোমার স্পর্দ্ধা দেখে আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

পার্বতীবাঈ শিউড়ে উঠলেন।

কিন্তু বন্দীর চোখে মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই।

—সেকেন্দার শাহ্‌কে ধন্যবাদ। এর চাইতে বড় আশীর্বাদ আমার কাছে আর কিছুই নেই।

—উত্তম। নিয়ে যাও বন্দীকে আর এই মুহূর্তে আমার দণ্ডাদেশ পালন কর।

বন্দী যাবার আগে পুনরায় অভিবাদন করল পার্বতীবাঈকে।

—চলি রাজকুমারী। পরজন্মে যেন আপনার পিতার মত রাজা পাই।

সৈনিক বন্দীকে নিয়ে প্রস্থান করল।

আলেকজাণ্ডার সেলিউকসকে বললেন—সেনাপতি অস্তক-রাজ্যের ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য। আপনি অস্তক আক্রমণের ব্যবস্থা করুন। তারা প্রস্তুত হবার আগেই আমরা আক্রমণ করব।

—যথা আজ্ঞা সম্রাট।

—শ্রেষ্ঠী উগ্রসেন আর হস্তীকে সংবাদ পাঠান। মশকাবতীর ভার আমি ওদের দিয়ে যেতে চাই। আমার অবর্তমানে তারাই এই রাজ্য শাসন করবেন।

ফিলিপ্পাস বললেন—রাজকুমারীর প্রতি আপনার কি আদেশ সম্রাট ?

—আমি ভেবে স্থির করব। আপাততঃ তাকে বন্দিনীই থাকতে হবে।

চম্পা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি।

এবারে সে ধীরপদে সম্রাটের কাছে এসে অভিবাদন করল।

—সম্রাট মহানুভব। অনুমতি পেলে এই দাসী কিছু নিবেদন করতে চায়।

আলেকজাণ্ডাররে ভ্রূকুঞ্চিত হল।

—কে তুমি, কি চাও ?

—সম্রাট, আমি শ্রেষ্ঠী উগ্রসেনের একজন প্রিয় পাত্রী। আমারই গৃহে রাজকুমারী বন্দিনী ছিলেন।

—কি চাও তুমি ?

—সম্রাট অনুমোদন করলে রাজকুমারীকে আমারই গৃহে রাখতে চাই। রাজকুমারীর যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয় সেদিকে আমি লক্ষ্য রাখব সম্রাট।

আলেকজাণ্ডার ফিলিপ্পাসের মুখের দিকে তাকালেন।

ফিলিপ্পাস বললেন—চম্পার উক্তি সত্য সম্রাট। শ্রেষ্ঠী উগ্রসেন চম্পাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন।

আলেকজাণ্ডার চম্পার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

—উত্তম, রাজকুমারী তোমার গৃহেই থাকুন।

চম্পা পুণরায় অভিবাদন করল।

—সম্রাটের জয় হোক।

পার্বতীবাঈ কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। চম্পা তাকে থামিয়ে দিল।

—দোহাই রাজকুমারী, আপনি এর অমত করবেন না।

পার্বতীবাঈ আর কোন কথা বললেন না।

ফিলিপ্পাস পার্বতীবাঈকে পুণরায় চম্পার গৃহে রেখে গেলেন। দ্বারে প্রহরী যেমন ছিল তেমনি রইল।

রাত হয়েছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে প্রহরীদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

চম্পা বলল—রাজকুমারী এবার আপনি বিশ্রাম করুন।

চম্পা চলে যাচ্ছিল কিন্তু পার্বতীবাঈ তাকে ডাকলেন।

—চম্পা।

—বলুন রাজকুমারী।

—তোমার অভিপ্রায় কি?

—আমি আপনার মঙ্গল কামনা করি।

—তোমাকে আমি বুঝতে পারছিনা চম্পা।

—তার কোন প্রয়োজন নেই রাজকুমারী। সময় মত ঠিক চিনতে পারবেন।

—আর একটি কথা।

—বলুন।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বিবাহিতা। তোমার স্বামী কোথায়?

—প্রয়োজনীয় কাজে মশকাবতীর বাইরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ যুদ্ধ লেগে গেল। তাই তিনি এখন এখানে নেই।

—শ্রেষ্ঠী উগ্রসেনের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়।

—ক্ষমা করবেন রাজকুমারী এ প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পারব না।

—কেন চম্পা?

—রাত হয়েছে রাজকুমারী। আপনি এখন শুয়ে পড়ুন। আবার পরে দেখা হবে।

চম্পা চলে গেল।

পার্বতীবাঈ গভীর ভাবে নিজের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

অদৃষ্টে তার কি আছে কে জানে।

পার্বতীবাঈ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

কিসের যেন একটা শব্দ হল। ঘুম ভেঙে গেল পার্বতীঈ-এর।

মনে হল ঘরের মধ্যে কে যেন হাঁটছে।

অন্ধকার, কিছু দেখা যায়না। কিন্তু মৃদু পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

—কে চম্পা?

পার্বতীবাঈ প্রশ্ন করলেন।

কোন জবাব নেই। পদশব্দ যেন থেমে গেল।

পার্বতীবাঈ উঠে বসলেন।

একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখা গেল। মূর্তি পুরুষের। পার্বতীবাঈ-এর কপালে স্বেদ বিন্দু দেখা গেল।

—কে? কে তুমি?

এবার অস্ফুট স্বরে ছায়ামূর্তি কথা বলল।

—চুপ, কোন শব্দ করবেন না। চম্পা কোথায়?

—জানিনা। কে তুমি?

এমন সময় চম্পা ঘরে ঢুকল।

—প্রতাপ, এসেছ তুমি? সব প্রস্তুত তো?

—হ্যাঁ, সব প্রস্তুত।

পার্বতীবাঈ বললেন—ব্যাপার কি চম্পা? অন্ধকারে ভাল লাগছেনা। আগে আলো জ্বাল।

প্রতাপ বাধা দিয়ে বলল—না রাজকুমারী, তাতে বিপদ হতে পারে।

চম্পাও প্রতাপের কথায় সায় দিল।

—আমাদের সকলের বিপদ হবে। এই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের পালাতে হবে।

—পালাতে হবে? কোথায় পালাব?

—পুষ্করাবতীতে। এই মুহূর্তে আমরা রওনা হব। প্রতাপ অশ্ব প্রস্তুত করে রেখেছে।

পার্বতীবাঈ দ্বিধাভরে বললেন—কে এই প্রতাপ ?

চম্পা উত্তর করল—আমার স্বামী। মহারাজের পত্র নিয়ে পুষ্করাবতী গিয়েছিলেন। ফিরে এসেই আত্মগোপন করতে হল। কারণ ধরা পড়লে তার পরিণাম কি হবে আপনি তা সহজেই অনুমান করতে পারেন। যে দূত অন্তক রাজ্যে গিয়েছিল তার পরিণাম আপনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন।

পার্বতীবাঈ দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন।

—তাহলে উগ্রসেনের সঙ্গে তোমার—

চম্পা তাড়াতাড়ি জবাব দিল—সম্পূর্ণ অভিনয়। তার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমাকে অনেক অভিনয় করতে হয়েছে। আপনার সঙ্গেও আমি অভিনয় করেছি, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। কিন্তু এ ছাড়া আপনাকে রক্ষা করার আর কোন উপায় ছিলনা রাজকুমারী।

প্রতাপ তাড়া লাগাল—দেরী করবেন না রাজকুমারী তাহলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

—দ্বারে প্রহরী রয়েছে। আমরা যাব কোন পথে ?

—এই ঘর থেকে বেরুবার একটি গুপ্ত পথ আছে। গুপ্তচরের কাজ করতে হলে প্রকাশ্য পথে সর্বদা যাতায়াত করা চলেনা। গুপ্তপথ দিয়ে আমরা পালিয়ে যাব।

ঘরে একটি আলমারী ছিল। তার দরজা খুলতেই দেখা গেল একটি সুরঙ্গ পথ।

তিনজনে অতি সন্তর্পনে সুরঙ্গ পথে ঢুকে পড়লেন।

গুপ্তপথ বেয়ে তারা একটি খোলা মাঠে এসে উপস্থিত হলেন। পার্বতীবাঈ দেখলেন সামনেই নগর প্রাকার।

প্রতাপ পূর্বেই একটি মই-এর ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সেই মই বেয়ে তারা প্রাচীরের উপর উঠে পড়লেন।

প্রাচীরের অপর পার্শ্বে দুটি ঘোড়া দেখা গেল।

প্রতাপ বলল—ভগবান আমাদের উপর প্রসন্ন। সমস্তই ঠিক আছে দেখছি।

কিন্তু ভগবান তাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না।

একজন প্রহরী তাদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল—কে তোমরা? দাঁড়াও।

চম্পা দ্রুতবেগে গাছ বেয়ে নিচে নেমে গেল।

কিন্তু একাজে অনভ্যস্ত পার্বতীবাঈকে নিয়ে প্রতাপ বিব্রত হয়ে পড়ল।

—রাজকুমারী, বিপদের সময় লজ্জা করলে চলবে না। আপনি আমার পিঠে উঠুন। আপনাকে নিয়ে আমি গাছ বেয়ে নিচে নামতে পারব।

পার্বতীবাঈ সঙ্কোচ করতে লাগলেন।

প্রতাপ পুণরায় বলল—সঙ্কোচের সময় নেই রাজকুমারী। আসুন।

পার্বতীবাঈ প্রতাপের গলা জড়িয়ে ধরলেন। প্রতাপ মুহূর্তের মধ্যে নিচে নেমে এসে ঘোড়ার সামনে উপস্থিত হল।

দুটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিল প্রতাপ।

পার্বতীবাঈ একটি ঘোড়ার উপর উঠে বসলেন। অপর ঘোড়ায় উঠল প্রতাপ আর চম্পা।

প্রতাপ আগে আর পিছনে পিছনে পার্বতীবাঈ।

ওদিকে প্রহরীর চিৎকার শুনে অন্যান্য প্রহরীরা এসে উপস্থিত হল। দ্রুতবেগে তারা প্রাচীরের উপর উঠে দেখল দুটি ঘোড়া ছুটে পালাচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে একজন প্রহরী তীর নিক্ষেপ করল।

অব্যর্থ লক্ষ্য।

তীর রাজকুমারীর পিটে বিদ্ধ হল। আর্তনাদ করে পার্বতীবাঈ ভূতলে পড়ে গেলেন।

চম্পা আর্তস্বরে বলল—পারলাম না প্রতাপ, এত করেও রাজকুমারীকে রক্ষা করতে পারালাম না।

প্রহরীরা ছুটে আসছে। তীর ছুঁড়ছে ঘন ঘন।

প্রতাপ আর পিছন ফিরে তাকাল না।

তার অশ্ব ছুটে চলল বিদ্যুৎ বেগে।

॥ এগার ॥

বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে কিশোরদেব অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। প্রাণ বেঁচেছে কিন্তু মনে শান্তি নেই। পিতামাতা দুজনেই যুদ্ধে নিহত। দিদি পার্বতীবাঈ-এর কি হয়েছে জানেন না। নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। তবে? কি রইল তার জীবনে। এমন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি?

পরক্ষণেই মনে পড়ল পুণ্ডরীকের কথা। শাস্তি দিতে হবে বিশ্বাসঘাতকদের তবেই তার পিতামাতার আত্মা শান্তিলাভ করবে। হ্যাঁ, শাস্তি দেবেন তিনি। যারা তার এই সর্বনাশের মূল তাদের তিনি ক্ষমা করবেন না। তাকে বাঁচতে হবে। নিজের হাতে দণ্ড দিতে হবে দেশদ্রোহীদের। চরম দণ্ড।

কিন্তু এখন তিনি কোথায় যাবেন। দীর্ঘ দু-দিন তিনি বনের ফলমূল খেয়ে বেঁচে আছেন। তৃষ্ণায় জল পেয়েছেন পাহাড়ী ঝরনায়।

একটা আশ্রয় না পেলে কেমন করে বাঁচবেন? লোকালয়ে যেতে ভয় হয়। যদি কেউ চিনতে পারে আর সে যদি শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হয়? তবে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তিনি মরতে চান না, বাঁচতে চান।

সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে কেটে যায় কিন্তু রাত্রি এলে তার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে।

গভীর বন। সন্ধ্যার পরেই সুরু হয় নরখাদক পশুদের আনাগোনা।

একটি বড় গাছের মাথায় তিনি আশ্রয় নেন।

তৃতীয় দিন কিশোরদেব একটি গাছে উঠে ফল পাড়ছিলেন। এমন সময় কিসের একটা শব্দ শুনতে পেয়ে সচকিত হলেন।

কে যেন দৌড়ে এদিকেই আসছে। তারই পদশব্দ শুনতে পাচ্ছেন কিশোরদেব।

গাছের আড়ালে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আত্মগোপন করে রইলেন তিনি।

একটু বাদেই একটি বন্যপশু এসে লুটিয়ে পড়ল গাছের নিচে। পশুর গায়ে একটি তীর বিঁধে আছে।

কিশোরদেব বুঝলেন কোন শিকারী এসেছে বনে। কিন্তু কোথায় সেই শিকারী?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ এলনা।

কিশোরদেব গত দুদিন প্রায় অনাহারে কাটিয়েছেন। ভাবলেন, কেউ যদি শিকার নিতে না আসে তবে তিনি আজ এই পশুর মাংস খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবেন।

তিনি কটিবন্ধ থেকে ছুরি খুলে হাতে নিলেন। তারপর নেমে এলেন গাছ থেকে।

মৃত পশুটির কাছে এসে তার উপর বার কয়েক ছুরিকাঘাত করলেন। কি জানি যদি না মরে থাকে।

না, মরেছে পশুটা।

অকস্মাৎ ঝোপের আড়াল থেকে স্পষ্ট কথা শোনা গেল। দুজন লোক কথা বলছে।

—গেল কোথায়? তীর বিঁধেছে, বেশীদূর যেতে পারবে না।

—এ দিকেই এসেছে। চল আরও একটু এগিয়ে দেখি। নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

শিকারী দুজন বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে। দেখল গাছের নিচে পড়ে আছে তাদের শিকার আর তারই পাশে উদ্যত ছুরিকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটি কিশোর।

কিশোরদেবও তাকিয়েছিল শিকারীদের দিকে। দেখলেন দুজন অর্দ্ধনগ্ন শিকারী। হাতে ধনুক, পিঠে তূন। মুখ হিংস্রতায় ভরা।

একজন শিকারী এগিয়ে এল কিশোরদেবের কাছে।

—কে তুমি ?

কিশোরদেব কোন জবাব দিলেন না।

—এই গভীর বনে তুমি কেমন করে এলে ? দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোন বড়ঘরের ছেলে।

কিশোরদেব তবু নিরুত্তর। কি পরিচয় তিনি দেবেন ?

অপর শিকারী এবার এগিয়ে এল।

—এ শিকার আমাদের।

কিশোরদেব মুখ খুললেন।

—নিয়ে যাও তোমাদের শিকার।

—কিন্তু তুমি কে ? কেন এসেছ এই বনে ?

—বলব না।

—তোমাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

—কোথায় ?

—আমাদের সর্দারের কাছে।

—কেন ?

—কি উদ্দেশ্যে এই বনে এসেছ, তা তোমাকে বলতে হবে।

—যদি তোমাদের সর্দারের কাছে না যাই।

—জোর করে নিয়ে যাব।

কিশোরদেব ভাবলেন—গেলেই বা ক্ষতি কি। ভগবান প্রসন্ন হলে হয়তো একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে।

—বেশ, চল তোমাদের সর্দারের কাছে। যা বলবার তাকেই বলব।

একজন শিকারী পশুটা কাঁধে তুলে নিল।

অপরজন বলল—চল।

কিশোরদেব তাদের অনুসরণ করলেন।

অনেকটা পথ হেঁটে অবশেষে একটি সমতল ভূমিতে এসে তারা থামলেন। সমতল জমির উপর অনেকগুলি কুটির। আরণ্যদলের আস্তানা।

কিশোরদেবকে দেখে প্রত্যেক কুটির থেকে লোক বেরিয়ে এল। বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সকলের চোখে অদ্ভুত বিস্ময়।

অপেক্ষাকৃত একটি বড় কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন সর্দার।

কিশোরদেবকে দেখে সর্দারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—একি! রাজকুমার কিশোরদেব!

সকলেই হতভম্ব।

সর্দার নতজানু হয়ে অভিবাদন করলেন কিশোরদেবকে।

কে এই কিশোর? যার কাছে দুর্দান্ত সর্দার পর্যন্ত মাথা নত করছেন। কিশোরদেবও বিস্মিত হলেন।

এই আরণ্য সর্দার ছিলেন মশকাবতীর রাজার সামন্ত। কিশোরদেব তাকে না চিনলেও তিনি চিনতেন কিশোরদেবকে।

প্রথম পরিচয়ের পর কিশোরদেব সর্দারকে সব খুলে বললেন।

সর্দারের হিংস্র মুখখানা আরও হিংস্র হয়ে উঠল।

—মহারাজ নিহত। আজ থেকে আপনি আমাদের রাজা।

এত দুঃখেও কিশোরদেব হেসে ফেললেন।

—রাজা! যার রাজ্য নেই, সৈন্য নেই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই—সে আবার রাজা।

সর্দার বললেন—কে বললে আপনার কিছু নেই কুমার। এই আরণ্যদল আপনার সৈন্য। এই বন আপনার রাজ্য আর এই গৃহই

আজ থেকে রাজগৃহ। এই সর্দার আর তার অনুচরবৃন্দ আপনার গোলাম। আপনার হুকুমে তারা জীবন দেবে।

কৃতজ্ঞতায় কিশোরদেব মাথা নত করলেন।

কিশোরদেব আশ্রয় পেলেন। নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিন্তু মনে শান্তি নেই।

সর্দার সংবাদ সংগ্রহ করে আনেন। নানান সংবাদ।

গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার মশকাবতীর সিংহাসনে হস্তীকে বসিয়েছেন। এখন তিনি মহারাজ হস্তী। শ্রেষ্ঠী উগ্রসেন তার প্রধান উপদেষ্টা।

কিছুদিন পর সংবাদ পাওয়া গেল আলেকজাণ্ডার অস্তুক আর পুষ্করাবতী অধিকার করেছেন।

অণ্ডক বাধা দিয়েছিল কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারেনি।

পুষ্করাবতীর রাজা অষ্টক তিরিশ দিন যুদ্ধ করার পর নিহত হয়েছেন।

গ্রীক সৈন্যরা চরম অত্যাচার করছে।

অশ্বকায়ন রাজ্য জয় করে গ্রীক সম্রাট সাত হাজার বন্দী সৈন্যকে হত্যা করেছেন। তাদের অপরাধ স্বদেশ রক্ষার জন্য তারা গ্রীক বাহিনীকে বাধা দিয়েছিল।

সমস্ত উত্তরাপথে ভারতীয়দের উপর নির্মম অত্যাচার চলছে। এমন কি নারী আর শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না।

মালব দেশের প্রতিটি শহরের স্ত্রীলোক আর শিশুদের হত্যা করা হয়েছে সম্রাটের আদেশে। অনেক স্ত্রীলোক গ্রীকদের হাতে অপমানিত হবার ভয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শুনতে শুনতে কিশোরদেব কেঁদে ফেলেন। কি নিষ্ঠুর আর নির্মম এই গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার। অত্যাচারের বর্ণনা দিতে দিতে সর্দারের মুখ লাল হয়ে ওঠে নিদারুণ ক্রোধে।

কিন্তু উপায় কি?

সর্দার কিশোরদেবকে নানা প্রকার অস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিশোরদেবও অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ব করলেন। ধনুক বিদ্যায় হলেন শ্রেষ্ঠ। উড়ন্ত পাখিকে কিশোরদেব অনায়াসে তীর মেরে মাটিতে ফেলতে পারেন।

সর্দারও চুপ করে বসে নেই। তিনি তার অনুচরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। যেমন করে হোক তিনি কিশোরদেবকে পুনরায় মশকাবতীর সিংহাসনে বসাবেন—এই তার প্রতিজ্ঞা। শুধু সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা।

এমনি ভাবে দীর্ঘ দুটি বৎসর কেটে গেল।

আলেকজাণ্ডার একটির পর একটি রাজ্য জয় করছেন।

ঝিলাম আর চীনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা ছিলেন পুরু। তিনি যেমন বীর, তেমন তাঁর দেশাত্মবোধ। তিনি প্রস্তুত হলেন আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী রাজ্যদের আহ্বান জানালেন তাঁকে সাহায্য করতে।

অভিসারের রাজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে মহারাজ পুরুকে সাহায্য করবেন। কিন্তু সময়মত তিনি সরে দাঁড়ালেন।

তক্ষশীলার রাজা ছিলেন অম্ভী। পুরুর প্রতি তিনি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু বাহুবলে তার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি পুরুকে দমন করতে না পেরে অন্য কোন উপায়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় ছিলেন।

অম্ভী আলেকজাণ্ডারের নিকট দূত পাঠালেন। সম্রাট যদি তক্ষশীলা রাজ্য আক্রমণ না করেন তবে তিনি সম্রাটকে সাহায্য করবেন। আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি সম্রাটকে বহুসংখ্যক হাতি, ভেড়া এবং ষাঁড় উপঢৌকন পাঠালেন।

আলেকজাণ্ডার তক্ষশীলার দিকে না এসে ঝিলাম নদীর দিকে সৈন্য চালনা করলেন। উদ্দেশ্য, পুরুকে দমন করবেন।

মিত্রহীন পুরুরাজ অগত্যা হীনচেতা, দেশদ্রোহী রাজগণের সাহায্যের অপেক্ষা না করে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য নিজেই প্রস্তুত হলেন।

কিশোরদেব বনে বসেই সমস্ত সংবাদ জানতে পারলেন। বীর পুরুরাজ, তিনিই ভারতবর্ষের একমাত্র আশা-ভরসা। পরবর্তী সংবাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন কিশোরদেব।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের। কিশোরদেবের আশা পূর্ণ হল না। কিছুদিনের মধ্যে খবর পাওয়া গেল, পুরুরাজ যুদ্ধে পরাজিত। গ্রীকরা তাঁকে বন্দী করেছে। পুরুরাজের পুত্র নিহত হয়েছেন।

আলেকজাণ্ডার ছিলেন চতুর ও কুশলী। তিনি পূর্বেই পুরুর যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। পুরুরাজের নির্ভীক সৈন্যের বিরুদ্ধে তিনি সম্মুখসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সাহস পান নি। গোপনে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তিনি ঝিলাম নদী অতিক্রম করে পুরুকে আক্রমণ করেছিলেন। পুরুরাজ এ রকম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

এতেও কোন ক্ষতি ছিল না। পুরুরাজ সামলে নিয়ে প্রতি-আক্রমণ করতে পারতেন। কিন্তু বিধি বাম!

যুদ্ধের আগের দিন সমস্ত রাত মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। ঝিলাম নদীতীরের যুদ্ধক্ষেত্র হয়েছিল পিচ্ছিল আর কর্দমাক্ত। পুরুরাজের রথগুলির চাকা কাদায় আটকে অচল হয়ে পড়েছিল। তীরন্দাজেরা সুদীর্ঘ ধনুকের অগ্রভাগ মাটিতে রেখে তীর সংযোজন করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

এই সুযোগে গ্রীক অশ্বারোহী সৈন্যগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে পুরুরাজের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল।

কিন্তু পুরুরাজ পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন নি। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা অগ্রাহ্য করে তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সুদীর্ঘ আট ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর তিনি যখন বন্দী হলেন তখন তাঁর

/

দেহে নয়টি ক্ষত। সেই ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়ছিল, কিন্তু তাতে তাঁর কোন দুঃখ ছিল না; দুঃখ ছিল এই জন্য যে, বিদেশীর হাত থেকে তিনি নিজ রাজ্য রক্ষা করতে পারলেন না।

সব শুনে কিশোরদেব ভেঙে পড়লেন। তবে কি কোন উপায় নেই? ভারতবর্ষ কি রাহুমুক্ত হবে না?

সর্দার বললেন—ভুলে যাবেন না কুমার, এখানেই ভারতবর্ষের শেষ নয়। গ্রীকসম্রাট এখন পর্যন্ত জয়লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর নিজস্ব কৃতিত্বের চাইতে ভারতবাসীর বিশ্বাসঘাতকতাই বেশী দায়ী। তাছাড়া আলেকজাণ্ডার এখন পর্যন্ত কোন প্রথমশ্রেণীর রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি।

—এর পরে হয়তো গ্রীকবাহিনী মগধ আক্রমণ করবে।

—আমি কিন্তু তেমন কিছু অনুমান করি না কুমার। অমিত বলশালী মগধ। মগধরাজ্যের শৌর্যের কথা গ্রীকসম্রাট নিশ্চয় শুনে থাকবেন। মগধ আক্রমণ করলে গ্রীকদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে হয় আলেকজাণ্ডার অত বড় ভুল করবেন না। তিনি এবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি রাজ্য জয় করতে আসেন নি, তিনি এসেছেন লুঠ করতে।

সর্দারের অনুমান সত্যে পরিণত হল। আলেকজাণ্ডার আর অগ্রসর হলেন না। সৈন্যদের জলপথে পাঠিয়ে তিনি স্থলপথে ভারত পরিত্যাগ করলেন।

এ সংবাদ শুনে কিশোরদেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এত দিনে ভারতবর্ষ তবে রাহুমুক্ত হল!

একদিন সর্দার গৃহে ফিরলেন অত্যন্ত খুশী মনে।

কিশোরদেবকে বললেন—কুমার, আমাদের সুদিন আসন্ন। দীর্ঘ দুটি বৎসর আমরা এই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেছি। এবারে প্রস্তুত হোন কুমার, আপনার হৃত রাজ্য উদ্ধার করবেন।

—কিন্তু আমার সামর্থ্য কোথায় ?

—আমরা আপনাকে সাহায্য করব। আমার পাঁচশত অনুচর আপনার সঙ্গী হবে। তাছাড়া রাজনীতিতে বাহুবলের চাইতে কূটবুদ্ধির প্রয়োজন বেশী। এক ব্রাহ্মণ আপনাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন।

—ব্রাহ্মণ ? কে তিনি ? পুণ্ডরীক কি আজও জীবিত আছেন ?

—না, পুণ্ডরীক নন। তিনি আর জীবিত নেই।

—তবে কে এই ব্রাহ্মণ ?

—তক্ষশীলার বিষ্ণুগুপ্ত, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ চণকের পুত্র। লোকে তাঁকে চাণক্য বলেই জানে।

—তিনি আমাকে সাহায্য করবেন ?

—হ্যাঁ কুমার, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

—কোথায় ?

—তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এখানেই উপস্থিত আছেন। বাইরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। চলুন কুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন চলুন।

কিশোরদেব সর্দারের সঙ্গে বাইরে এলেন।

দেখলেন, এক ব্রাহ্মণ তারই জন্য অপেক্ষা করছেন।

॥ বার ॥

ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়েছিলেন একটি গাছের নিচে।

মাঝে মাঝে পদচারণা করছিলেন আর আপন মনেই কি যেন বলছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আকাশের সঙ্গে কথা কইছেন।

ব্রাহ্মণের উন্নত ললাট। মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি। চোখে আগুন। মুণ্ডিত মস্তকে একটি বৃহৎ শিখা।

কিশোরদেব এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণ তাকালেন কিশোরদেবের দিকে। তাঁর দৃষ্টি এত প্রখর যে কিশোরদেব তা সহ্য করতে না পেরে মাথা নত করলেন।

ব্রাহ্মণ কঠোর কণ্ঠে বললেন—আমার চোখের দিকে তাকাও।

সে আদেশ অমান্য করার মত শক্তি নেই কিশোরদেবের। তিনি তাকালেন। মনে হল ব্রাহ্মণ তাকে সম্মোহন করেছেন।

—তোমার নাম কিশোরদেব?

কিশোরদেব শির নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিশোরদেবের মুখের দিকে। অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

—হ্যাঁ, পারবে, তুমি পারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

কিশোরদেব সভয়ে প্রশ্ন করলেন—কি পারব?

—কি পারবে তুমি তা জাননা? তোমার জীবনে একটি মাত্রই কর্তব্য আছে।

—কি সেই কর্তব্য?

—প্রতিশোধ গ্রহণ। কুমার তোমার পিতৃহত্যা আর মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। কি, পারবে না?

—কিন্তু আমি সহায় সম্বলহীন। আমার অর্থ নেই, অস্ত্র নেই, সৈন্য নেই। কিছুই নেই আমার।

চাণক্য রুষ্ট হলেন।

—কুলাঙ্গার! পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে যে ভয় পায়, মাতৃহন্তাকে যে ক্ষমা করে তার মত কুলাঙ্গার আর কে?

কিশোরদেবের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বুকে তার তীব্র জ্বালা। দীর্ঘ দুটি বৎসর অশান্ত মন নিয়ে তিনি কি করে কাটিয়েছেন তা কেমন করে এই ব্রাহ্মণকে বুঝাবেন। কিশোরদেবের চোখ দুটি হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল।

—ভয় কাকে বলে কিশোরদেব তা জানে না। যদি সুযোগ পাই, বিশ্বাসঘাতকদের রক্ত দিয়ে আমি পিতামাতার তর্পণ করব।

—এইতো বীরের উপযুক্ত কথা। শোন কুমার, দু-একজন দেশদ্রোহীকে হত্যা করতে কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তুমি একাই তার পক্ষে যথেষ্ঠ। তবে এ ক্ষেত্রে তুমি একা নও। তোমার পিছনে আছে অগণিত জনসাধারণ। যারা অত্যাচার সহ্য করে আজও বেঁচে রয়েছে। তারাও এই অত্যাচারের প্রতিশোধ চায়। তুমি হস্তীকে নিধন করে হৃতরাজ্য উদ্ধার করবে। আমার বুদ্ধি আর সর্দারের অনুচরবৃন্দ তোমার সহায় হবে।

কিশোরদেব চাণক্যের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন।

—আপনি আমার পথনির্দেশ করুন। আপনার পাদস্পর্শ করে আমি প্রতিজ্ঞা করছি আপনার পরামর্শ মতই আমি চলব। এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম।

চাণক্য কিশোরদেবকে টেনে তুললেন।

—উত্তম! তাহলে তুমি প্রস্তুত হও। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

চাণক্য সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

উদ্‌ভ্রান্তের মত কিশোরদেব নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

গভীর রাত্রে ফিরে এলেন সর্দার।

বললেন—কুমার আমাদের এই মুহূর্তে রওনা হতে হবে। চাণক্যের আদেশ। আমার পাঁচশত অনুচর প্রস্তুত। আগামীকাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই আক্রমণ করব মশকাবতী। আজ রাত্রের মধ্যেই নগর প্রাকারের বাইরে পৌঁছুতে হবে। চাণক্য সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

কিশোরদেব প্রস্তুত হয়ে সর্দারের সঙ্গে বাইরে এসে দেখেন আরণ্য বাহিনীর যোদ্ধারা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে।

রাতের অন্ধকারে কিশোরদেব পাঁচশত অনুচর নিয়ে রওনা হলেন মশকাবতী।

আকাশের বুক থেকে অন্ধকার তখনো দূরীভূত হয়নি।

মশকাবতী নীরব, নিস্তব্ধ।

নগর প্রাকারের বাইরে অনেকগুলি বড় বড় গাছ আছে। তাদের শাখা-প্রশাখা এসে পড়েছে প্রাচীরের উপরে।

অতি সন্তর্পণে কিশোরদেব আর তার অনুচরবৃন্দ গাছ বেয়ে প্রাচীরের উপর উঠলেন। পরে মই বেয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন নগরের ভিতরে।

রাজা হস্তী নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিশোরদের যে জীবিত আছেন এ সংবাদ তিনি জানতেন না। তাছাড়া এমন ভাবে কখনো আক্রান্ত হতে পারেন এরূপ কল্পনাও তার ছিলনা। তাই নগর রক্ষার তেমন সুবন্দোবস্ত ছিলনা। যে কয়জন নগর রক্ষী ছিল তারাও বিপদের সম্ভাবনা নেই ভেবে রাজকার্যে অমনযোগী ছিল।

এছাড়া চাণক্য কিছু লোককে উৎকোচ দিয়ে বশ করেছিলেন।

কিশোরদেব নগরে প্রবেশ করতে যে কয়েকজন রক্ষী বাঁধা দিতে অগ্রসর হল তাবা সকলেই আরণ্যবাহিনীর হাতে নিহত হল।

হৈ হৈ শব্দে সর্দারের অনুচরেরা রাজপুরী অবরোধ করল।

হস্তীর সৈন্যগণ সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিল। অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে তারা দিশাহারা হয়ে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল।

যুদ্ধ বেশীক্ষণ স্থায়ী হলনা।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দী হলেন রাজা হস্তী এবং শ্রেষ্ঠী উগ্রসেন।

কিশোরদেব পিতৃরাজ্য অধিকার করলেন প্রায় বিনা যুদ্ধে।

চাণক্য বললেন—কুমার যবনেরা তোমার পিতামাতাকে নিশ্চয় কবর দিয়ে থাকবে। সেই কবর থেকে তাদের দেহ উদ্ধার করে হিন্দুমতে সৎকার করতে হবে।

কিশোরদেব ফিরে এসেছেন দেখে মহারাজার আমলের প্রজারা সকলেই আনন্দিত হলেন। তারাই সংবাদ দিলেন যে একটি গুহার মধ্যে মহারাজ এবং কৃপাদেবীকে কবর দেওয়া হয়েছে।

কবর থেকে উদ্ধার করা হল দুটি দেহ। দেহতো নয় দুটি নরকঙ্কাল।

কিশোরদেব তাদের সৎকারের ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু বাঁধা দিলেন চাণক্য।

—সৎকারের পুর্বে তোমার একটি বৃহৎ কর্তব্য বাকী রয়েছে। সেই কর্তব্য সাধনের পর পিতামাতার সৎকার করবে।

কিশোরদেব জিজ্ঞাসু নেত্রে চাণক্যের দিকে তাকালেন।

—আদেশ করুন গুরুদেব।

—দেশদ্রোহীদের রক্ত তাঁদের চিতায় আহুতি দিতে হবে। সর্বাগ্রে হত্যা কর হস্তী আর উগ্রসেনকে।

সর্দার সেখানেই উপস্থিত ছিলেন।

বললেন—আমার অনুচরেরা তাদের হত্যা করে রক্ত নিয়ে আসুক।

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে চাণক্য বললেন—না, কুমার স্বহস্তে তাদের হত্যা করবে। এদের নিধন করবার অধিকার সর্বাগ্রে কুমারের। সেই অধিকার থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে চাই না।

কিশোরদেব ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

চাণক্য সর্দারকে আদেশ করলেন—হস্তী আর উগ্রসেনকে এখানেই নিয়ে এস।

সর্দার সেই মুহূর্তে আদেশ পালন করলেন।

চাণক্য বললেন—কুমার, অস্ত্র নাও। তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

হস্তী কিশোরদেবের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন।

—কুমার, তুমি আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও। আমি কথা দিচ্ছি তোমার রাজ্য ছেড়ে আমি চিরদিনের মত চলে যাব। তুমি আমাকে ক্ষমা কর কুমার।

চাণক্য বললেন—এই কুমারের পিতা তোমাকে একদিন প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন। তুমি তার কি প্রতিদান দিয়েছ হস্তী?

হস্তী চাণক্যের কথার কোন জবাব দিলেন না।

—কুমার, আমাকে দয়া কর। আমায় তুমি বাঁচাও। তুমি মহৎ, তুমি উদার। আমার একটি শিশুপুত্র রয়েছে। তার মুখ চেয়ে তুমি আমার প্রাণভিক্ষা দাও। সেই কচি শিশুকে তুমি পিতৃহারা করোনা কুমার।

কিশোরদেব বিচলিত হলেন। বললেন—গুরুদেব—

চাণক্য ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

—সাবধান কুমার, তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর? তোমার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যেয়োনা। মনে রেখো দুর্বলের রাজত্ব করা চলেনা। নাও অস্ত্র গ্রহণ কর। মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও।

কিশোরদেব মুক্ত অসি হস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

হস্তী আবার বললেন—কুমার দয়া কর। আমাকে তুমি বাঁচাও।

বজ্রগম্ভীর স্বরে চাণক্য বলে উঠলেন—কুমার কিশোরদেব বিলম্বের কোন প্রয়োজন দেখিনা। আমি তোমাকে শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করছি তুমি একে হত্যা করবে কিনা।

কিশোরদেবের চোখ দুটি জ্বলে উঠল।

—হ্যাঁ প্রতিশোধ চাই। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই। মাতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই।

কিশোরদেবের মুক্ত অসি মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠল। হস্তীর ছিন্ন শির লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

চাণক্য উন্মাদের মত হা-হা করে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

—কলির ব্রাহ্মণ, তুমি আজও বেঁচে আছ।

চাণক্যের হাসি বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

উগ্রসেন ভয়ে চোখ বুজলেন।

চাণক্য বললেন—এইবার উগ্রসেন। সর্দার উগ্রসেনকে কুমারের সামনে নিয়ে এস।

সর্দার আদেশ পালন করলেন।

উগ্রসেন বললেন—মরতে আমি ভয় পাই না। তবে মরার আগে একটা কথা জানতে চাই।

কিশোরদেব শুনতে রাজী হলেন।

—বলুন, কি জানতে চান।

—এই রাজ্যের রাজা কে? কিশোরদেব না এই নররূপী পিশাচ।

চাণক্য বললেন—উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কুমার অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ নেই। নাও, হত্যা কর।

কিশোরদেব কোন কথা বললেন না।

মুহূর্তের মধ্যে উগ্রসেনের মস্তক দেহচ্যুত হল।

চাণক্য আবার হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন।

—কে বলে কলির ব্রাহ্মণের তেজ নিঃশেষ হয়েছে। না, আজও সে বেঁচে আছে। আজও বেঁচে আছে কলির ব্রাহ্মণ।

পরক্ষণেই চাণক্য নিজেকে সামলে নিলেন।

—কুমার তোমার রাজকার্যের আরও একটু বাকী আছে।

—কি গুরুদেব?

—আরও কয়েকটি হত্যা করতে হবে।

—আবার হত্যা?

—কুমার, আবার বলছি, রাজকার্যে দুর্বলতার স্থান নেই।

—কাকে হত্যা করতে হবে?

—কয়েকজন নগর রক্ষী। যারা আমার উৎকোচ গ্রহণ করে তোমাকে বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করতে সাহায্য করছিল।

কিশোরদেব স্তম্ভীত হলেন।

—সে কি গুরুদেব? তারাতো আমার হিতৈষী। আমার

পিতৃ সিংহাসন অধিকার করতে তারা আমাকে সাহায্য করেছে।

—ভুল করলে কুমার। তারা মোটেই তোমার হিতৈষী নয়। তারা তোমার শত্রু। তারা রাজকার্যে অবহেলা করেছে। এই অপরাধে তাদের প্রাণদণ্ড দিতে হবে।

এদের অবহেলার ফলে আমাদেরই সুবিধা হয়েছে। বিনা বাধায় নগরে ঢুকতে পেরেছি।

—শোন কুমার, উৎকোচ গ্রহণ করে যারা আজ হস্তীর বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করেছে তারাই একদিন তোমার বিরুদ্ধে অপরকে সাহায্য করবে। এদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাসঘাতকদের একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড। আর সেই দণ্ডই তুমি তাদের দেবে।

কিশোরদেব বুঝলেন এখানে বাক্যব্যয় বৃথা।

—আমাকে নিজের হাতে বধ করতে হবে?

—না, তার প্রয়োজন হবে না। সর্দার তার ব্যবস্থা করবে। তুমি শুধু দণ্ডাদেশ দেবে। বিচারে রাজ আজ্ঞা ব্যতীত শাস্তি হতে পারে না।

কিশোরদেব সম্মত হলেন।

—উত্তম, আমি তাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম। সর্দার, আমার আদেশ যাতে পালিত হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

সর্দার কিশোরদেবকে অভিবাদন করলেন।

—রাজ আজ্ঞা অবশ্যই পালিত হবে।

চাণক্য খুশী হলেন।

—চল কুমার, এবার তোমার পিতামাতার দেহ সৎকার করবে।

পাহাড়ের এক গুহার সামনে চিতা সাজানো হল।

কিশোরদেব নিজ হাতে সেই চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন। চিতা জ্বলে উঠল।

প্রজ্বলিত চিতায় আহুতি দেওয়া হল হস্তী আর উগ্রসেনের শোণিত।

কিশোরদেব মশকাবতীর সিংহাসনে বসলেন মাত্র ষোল বৎসর বয়সে।

কিছুদিন বাদে চাণক্য কিশোরদেবকে বললেন—কুমার, তুমি তোমার পিতৃরাজ্য অধিকার করেছ। দেশে এখন শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এইবার আমাকে বিদায় দাও।

—কেন গুরুদেব। এমন কি অপরাধ করেছি যে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে চান।

—কুমার, আমার অনেক কাজ এখনো বাকী রয়েছে। আমি শপথ করেছি সমস্ত অনাচার আর অত্যাচার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করব। হিন্দুস্থানের বুকে বিদেশীর চিহ্ন মুছে ফেলব এই আমার ব্রত। সেই ব্রত পালনে আমি সর্বাগ্রে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম। এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। এবার আমাকে মগধ যেতে হবে। তুমি বাধা দিওনা কুমার। তুমি আমাকে বিদায় দাও।

কিশোরদেব চাণক্যকে প্রণাম করলেন।

—আবার কবে গুরুদেবের দর্শন পাব।

—আমি নিজেও তা জানি না কুমার। প্রয়োজন হলে আমি নিজেই তোমার কাছে উপস্থিত হব। এখন তুমি আমার জন্য একটি রথ প্রস্তুত করতে আদেশ দাও।

কিশোরদেবের আদেশে রথ প্রস্তুত হল।

চাণক্য রথে উঠে বসলেন।

—চলি কুমার। আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হও।

কিশোরদেব পুনরায় চাণক্যের পদধূলি নিলেন।

রথ চলতে সুরু করল।

কিশোরদেব চলমান রথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

রথ ধীরে ধীরে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রভাত সূর্যের আলো তখন ছড়িয়ে পড়েছে মালাকান্দ গিরিপথে।

কিশোরদেব লক্ষ্য করলেন পাহাড়ের একটি চূড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠেছে। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চূড়াটি আরও রক্তাভ হতে লাগল।

এই পাহাড়েরই একটি গুহায় কিশোরদেব পিতামাতার সৎকার করেছিলেন দেশদ্রোহীদের শোণিত আহুতি দিয়ে। শোণিত তৃপ্ত চিতার ধূয়া স্পর্শ করেছিল পাহাড়ের চূড়া।

সেই দিন থেকেই চূড়াটি অমন রক্তাভ। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রক্তের রঙে রাঙা।

কিশোরদেব চূড়াটির নাম রাখলেন রাণীগিরি।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন ইতিহাস বুকে নিয়ে আজও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে রাণীগিরি।

আজও সে তেমনি লাল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তেমনি রক্তের রঙে রাঙা।

* * *